(67)

OCCASIONAL PAPER NO.150

চৈতন্য আখ্যান

LIBRARY
-8 JAN 1996
Institute of
Development Studies

দেবেশ রায়

CENTRE FOR STUDIES IN SOCIAL SCIENCES,
CALCUTTA

BN 229455

OCCASIONAL PAPER NO.150

চৈতন্য আখ্যান

দেবেশ রায়

জুন ১৯৯৫

IDS
097733

CENTRE FOR STUDIES IN SOCIAL SCIENCES,
CALCUTTA
10, Lake Terrace, Calcutta—700 029

ভূমিকা

বাংলায় উপন্যাস সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল পাশ্চাত্যশক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিঘাতের ফলে। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি উপন্যাসের এক বিশেষ ধরণকেই তাঁর মডেল হিশেবে বেছে নিয়েছিলেন। তার একটি পরিণতি হল এই যে বাংলা সাহিত্যে আখ্যান রচনার যে - ধারা তিন-চারশ বছর ধরে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছিল, সেই ধারাটি উপন্যাস সাহিত্যের সঙ্গে মিশতে পারল না।

আমি কয়েক বছর ধরেই চেষ্টা করে আসছি - বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে এই আখ্যান রচনার ধরণটি কী ছিল তা বুঝতে। ইতিপূর্বে বাংলা রামায়ণ ও মঙ্গলকাব্যের ভিতর এই আখ্যানের বৈশিষ্ট্য খোঁজার চেষ্টা করেছি। এখানে চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের মধ্যে সেই আখ্যানের বৈশিষ্ট্য খুঁজেছি।

এটা একটি বৃহত্তর প্রকল্পের ভূমিকা - অংশ মাত্র। এই ভূমিকায় যে সূত্রগুলি নিধারিত হয়েছে, পরবর্তী অংশে চৈতন্যজীবনীর পাঠ্যবস্তু আলোচনায় তা প্রয়োগ করা হবে। প্রথম নিবন্ধটি সেন্টারে একটি সেমিনারে পড়া হয়েছিল ও আমার সহকর্মীদের সঙ্গে সেখানে মত বিনিময়ের সুযোগ ঘটেছিল।

চৈতন্য আখ্যান

এক

নির্মাণের ভূমিকা

চর্তুদশ-পঞ্চদশ শতকে নতুন ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাথমিক অভিঘাতে ভারতের বিভিন্ন অংশে হিন্দুধর্মের বৃহত্তর পরিমন্ডলের আশ্রয় থেকেই কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের বোধ ও অনুভবের সত্যকে প্রথা, আচার ও শাস্ত্রীয় ধর্মের বিকল্প হিশেবে প্রচার করেছিলেন। তাঁদের কিছু অনুগামীও তৈরি হয়েছিলেন ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরে তাঁদের অনুগামীরা এক-একটা ধর্মমতও সংগঠিত করেছেন। সে-ধর্মমত হিন্দুধর্ম ও ইসলামের ঐতিহ্য থেকে পৃথক। উত্তরভারতের রামানন্দ, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের নামদেব, পশ্চিম ভারতের নানক, উত্তর ভারতের কবীর, পূর্ব ভারতের চৈতন্য, উত্তর-পশ্চিম ভারতের মীরাবাঈ, পূর্ব ভারতের তুলসীদাস, উত্তর ভারতের রবিদাস - সেই ব্যক্তিগত অনুভবের ধর্মকে প্রতিষ্ঠানের ধর্মের বিরুদ্ধে রূপ দিয়েছিলেন। এখন আমরা এই ধর্মীয় নেতাদেব ভক্তি - আন্দোলনের অন্তর্গত কবে দেখি। তাঁদের ভিতরে সময়ের ও মতের পার্থক্য ছিল অনেকটাই। রামানন্দ রামভক্তিকেই তাঁর ধর্ম বলে প্রচার করতেন ও তাঁর প্রত্যক্ষ অনুগামীদের মধ্যে একজন ছিলেন নাপিত, একজন মুচি, একজন মুসলমান। রামভক্তির অনুভবহ প্রচার করেছেন গোস্বামী তুলসীদাস। কিন্তু সে-ভক্তিতে হয়ত হিন্দুধর্মের বর্ণভেদের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ ছিল না। কবীর ও নানক ধর্মীয় ঈশ্বরকেই অস্বীকার করতেন আর মীরার বিদ্রোহ ছিল হিন্দুধর্মের আদর্শের ভিতরই এক অন্তর্ঘাত - পাতিব্রত্যের আদর্শ দিয়েই স্বামী ও সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। স্মৃতি-শাসিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে চৈতন্য যে - 'হরির্নামৈব কেবলম' ধর্ম প্রচার করেছিলেন তার মূল লক্ষ ছিল আচন্ডালে কোল দেয়া।

এই ভক্ত ও সন্ত বিদ্রোহীদের পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের ভিতরে মিল ছিল তিনটি বিষয়ে। ১) তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত আচরণ দিয়ে নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তাঁরা আগে নিজেদের একটা মত ঠিক করে নিয়েছেন ও পরে সেই মতের অনুকূলে আচরণবিধি বানিয়েছেন - তা নয়। তাঁদের নিজেদের জীবনই হয়ে উঠেছিল তাঁদের প্রচারিত বাণীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ২) তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই হিন্দু ধর্মের বর্ণভেদকে অস্বীকার করেছেন ও বর্ণভেদবিভক্ত সমাজের জায়গায় কল্পনা করেছেন এক মানব-ঐক্যের। সেদিক থেকে তাঁরা হিন্দু ধর্মের আচার-আচরণেরও বিরোধিতা করেছেন। ৩) কিন্তু তাঁদের সেই বিরোধিতা ও বিদ্রোহের আধার ছিল সরলতম, সহজতম বিশ্বাস, যাকে ভক্তি বলা যায়, তাঁরাও অনেকে যাকে ভক্তিই বলেছেন। সেই বিশ্বাস বা ভক্তি কখনো মীরার গিরিধারীলালের প্রতি প্রেমের অন্তর্গূঢ় টান, কখনো তুলসীর রামচন্দ্রের প্রতি এক বিকল্পহীন আত্মসমর্পণ, কখনো চৈতন্যের কৃষ্ণবিরহের কাতরতা, কখনো নানকের সর্বত্রচারী ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংলাপ স্থাপনের নিশ্চয়তা। তাঁরা ধর্মের এক মূল ব্যাখ্যাকে পুনরুদ্ধার করে নিজেদের ধর্মীয়তার ভিতর থেকেই সেই ব্যাখ্যাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। তাই তাঁদের জীবনাচরণে একদিকে ছিল আনুগত্য, তাঁদের ইষ্টের সঙ্গে সম্পূর্ণ লিপ্ততা, এক জীবনবিস্তারী ধর্মীয়তা। আর-একদিকে সেই আনুগত্য, সেই লিপ্ততা ও সেই ধর্মীয়তাই তাঁদের দাঁড়া করিয়েছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, তাঁদের জীবনাচরণকে স্থাপন করেছে ধর্মীয় আচারের অনড়তার বিরুদ্ধে, তাঁদের লোকায়ত উৎসকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে ধর্মীয় পৌরাণিকতার বিরুদ্ধে। ব্যক্তিগত জীবন ছাড়া এঁদের ধর্মের আর - কোনো

নিরিখ বা প্রমাণ নেই। এঁদের সেই ব্যক্তিগত জীবনই পরবর্তী কালে হয়ে উঠেছে কারো কারো বেলায় নতুন ধর্মমতের ভিত্তি।

প্রাক-আধুনিক সেই যুগে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের এই ভক্তরাই রাজপুরুষদের সমান্তরালে ব্যক্তিকীর্তি স্থাপন করতে পেরেছিলেন। সেই ব্যক্তিকীর্তির কিছু প্রকাশ হয়ত ঘটেছে মীরার গানে বা তুলসীর 'রামচরিতমানসে', কবীরের দোঁহায় বা নানকের ভজনে। কিন্তু তাঁদের প্রধানতম কীর্তি ছিল তাঁদের নিজেদের জীবন। তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস ও অনুভবকে জীবনে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন যে সেই জীবনই হয়ে উঠেছিল ধর্মতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের প্রতিস্পর্ধী এক অবস্থান। সেই জীবনের উদাহরণই হয়ে উঠেছিল এক নতুন জীবনাদর্শ। ইংরেজোত্তর ভারতবর্ষে ব্যক্তির কীর্তির ও প্রতিষ্ঠার যে - আধুনিক পারপ্রেক্ষিত আমরা পাই, তার-আফগান শাসনের অবসান ও মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী অবকাশে সেই চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে তেমন কোনো পরিপ্রেক্ষিতের কল্পনাও ছিল অবাস্তব। সে-যুগ ব্যক্তির বিকাশ ও কর্মের অনুকূল ছিল না। ব্যক্তিকীর্তি সব সময়ই যুক্ত থাকত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে। দেশজয়ই ছিল ব্যক্তিকীর্তির প্রধান নিরিখ। কিন্তু সেই ব্যক্তি পরিপ্রেক্ষিতহীন ইতিহাসে এই ভক্তরা আধুনিক অর্থেই এক ব্যক্তিকীর্তি স্থাপন করেছিলেন নিজেদের জীবন দিয়ে। উৎপাদন ব্যবস্থার যে-আধুনিক পারবতনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ভূমিকা স্বীকৃত হয়, এই ভক্ত সন্তরা সেই পরিবর্তনের সমর্থন ছাড়াই ব্যক্তির এক আধুনিক ভূমিকা সেই কালে আয়ত্ত করেছিলেন।

সেই ভূমিকা আয়ত্ত করার প্রক্রিয়ায় তাদের জীবনাচরণ থেকে এক-এক ধরণের জন-আন্দোলন তৈরি হয়ে উঠেছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই জন-আন্দোলনে এসে জড়ো হয়েছে প্রধানত হিন্দুধর্মের ও গৌণত ইসলামধর্মের মুখ্য শ্রেণীর ও গোষ্ঠীর বাইরের মানুষ। সেই জনসমষ্টি এই ভক্তদের জীবনকে পরিপ্রেক্ষিত দিয়েছে। আর সেই জন-আন্দোলনের ফলেই এই ভক্তদের জীবন ব্যক্তিগত কীর্তি হয়ে উঠেছে। উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়াও সামাজিক শক্তি এক-একজন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে এই যে - নতুন তাৎপর্য অর্জন করেছে, সেই প্রক্রিয়ার ভিতরই হয়ত নিহিত আছে ভারতীয় আধুনিকতায় ব্যক্তির এক নতুন ভূমিকা। গান্ধী হয়ত সেই ভূমিকাকেই আধুনিক সময়ে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন।

এই ভক্ত সন্তদের ব্যক্তিজীবন তাই এত তাৎপর্যময়। আমাদের প্রাক্-আধুনিক ইতিহাস নথিপত্রের দ্বারা খুব বেশি প্রামাণিক নয়। সে তুলনায় এই ভক্ত সন্তদের জীবনী অনেক বেশি প্রামাণিক। হয়ত জন্মতারিখ নিয়ে কোথাও মতভেদ আছে, হয়ত মৃত্যুর কারণ নিয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে, তৎসত্ত্বেও যেহেতু তাঁরা এক-একটি জন-আন্দোলনের শীর্ষে ছিলেন, তাই অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শী কোনো-না-কোনো ভাবে তাঁদের অভিজ্ঞতা জানিয়ে গেছেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে সরাসরি এঁদের কাহিনী আরো ছড়িয়ে পড়েছে, একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এই ভাবে পরবর্তীকালে একটা কোনো জায়গায় মিশেছে, আবার সেই একত্রিত কাহিনী থেকে আরো নতুন কাহিনী সম্প্রসারিত হয়েছে। এঁদের জীবন ঘিরে পুষ্ট হয়েছে মৌখিক ইতিহাসের এক ধারা। এদের জীবনই যেহেতু এঁদের প্রধানতম কীর্তি ও সেই জীবনই যেহেতু এঁদের অনুগামীদের প্রধানতম অবলম্বন, তাই এঁদের অনুগামীরা সেই জীবনকে নথিভুক্ত করে রাখতে চেয়েছেন, সেই জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন, আবার একই সঙ্গে চেয়েছেন সেই জীবনকে নিজেদের কল্পনার সৃষ্টি হিশেবে নির্মাণ করতে। সেই বিশ্বস্ততা ও কল্পনা দু-এক জায়গায় মিশে গিয়ে থাকলেও বেশির ভাগ সময়ই পৃথক থেকেছে। তাই, এই সব উপাদানের ওপর নির্ভর করে এঁদের জীবনকাহিনীর পুনর্নির্মাণ সম্ভব। আবার তাঁদের জীবনের কোনো কাহিনী অবলম্বন করে কোনো কল্পনা আকার নিয়েছে তার বিনির্মাণও

সম্ভব। সেই পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবনতথ্য নতুন ভাবে বিন্যস্ত করা যায় ও সে-রকম আধুনিক চেষ্টা যে হচ্ছে না তাও নয়।

সেই পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণে কখনো তাঁদের জীবনের তথ্যই প্রধান হয়ে ওঠে, কখনো-বা তথ্য তুচ্ছ হয়ে যায়, প্রধান হয়ে ওঠে সেই তথ্যকে ঘিরে রা কোনো তথ্যের সমর্থনহীন কল্পনার লীলা। কারণ তাঁদের জীবনের কালানুক্রমিক বিবরণের যে অংশগুলিতে ফাঁক থাকে, সেই অংশগুলি জুড়েই ভরে ওঠে তাঁদের অনুভব, বোধ ও আবেগ। আবার তাঁদের ঘিরে যে-কল্পনা যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠে, সেই সব কল্পনার অন্তর্বর্তী অবকাশে লুকনো থাকে তাঁদের জীবনের তথ্য।

দুই

প্রাক-ইংরেজ বাঙালি ভারতীয় সমাজে - সংস্কৃতিতে চৈতন্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তুলনাহীন। ইংরেজ - সভ্যতার সঙ্গে অভিঘাতে বাঙালি - ভারতীয় জীবনে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার ছিল এক গভীর অর্থনৈতিক ভিত্তি। সেই নতুন অর্থনীতির প্রয়োজনে সারা ভারতে এক ঔপনিবেশিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একই প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, মুদ্রাব্যবস্থা, সামরিক ব্যবস্থা সেই ঐক্যকে অনেক বেশি প্রামাণিক করে তুলেছিল। সেই প্রামাণিকতা সমাজে-সংস্কৃতিতেও ছড়িয়ে যেতে পেরেছে। বাংলা ভাষার প্রকাশভঙ্গি নতুন হয়ে উঠেছে, সাহিত্যে নতুন-নতুন বিষয় এসেছে, আমাদের চিত্রকলাচর্চা থেকে সঙ্গীতচর্চা পর্যন্ত একটা ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত পেয়েছে, নাট্যচর্চায় পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব এসেছে। বস্তুত আমাদের জীবনের এমন কোনো দিকই হয়ত ছিল না যা এই ইঙ্গনিসান্সের প্রত্যক্ষতাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে।

ব্যবস্থার এই সমর্থন ছাড়াই চৈতন্যের জীবন বাঙালি-ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রায় অনেকখানি তুলনীয় ভাবে বদলে দিয়েছিল। চৈতন্যের আগে বাংলা সাহিত্য - সঙ্গীত - চিত্রকলা - ধর্মচিন্তা - দর্শনচিন্তা যা ছিল, চৈতন্যের পরে আর তা ছিল না। রামায়ণ-মহাভারতের মত এপিকে চৈতন্যের যেমন প্রবেশ ঘটেছে, তেমনি, লোকজীবনে লোকশিল্পে চৈতন্য বিষয় হয়ে উঠেছেন। চৈতন্যের জীবনের ফলে যেমন ভাগবতপুরাণের ব্যাখ্যা বদলে গেছে, তেমনি পদাবলি সাহিত্যে চৈতন্য থেকেই এক নতুন ধরণের পদাবলির শুরু। চৈতন্যের জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ও বাংলার অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রমুখ চৈতন্য অনুগামীরা যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নতুনতর ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন ও চৈতন্য জীবন একটা দার্শনিক ভিত্তি পাচ্ছিল, তেমনি চৈতন্যের জীবনের অনুপ্রেরণায় সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে ধর্মাচরণের এক অন্য অধিকারবোধ তৈরি হয়েছিল। এই অধিকারবোধ ধীরে ধীরে কয়েক শতাব্দী ধরে গোপন গূঢ়চারী ধর্মীয় সংগঠনে লুপ্ত হয়ে যায়, এ-কথা ঠিকই, ও রাধাকৃষ্ণের বা কৃষ্ণ-গোপিনীদের সম্পর্কের যে-অনুভব চৈতন্যকে দিব্যোন্মদনার দিকে নিয়ে গেছে সেই অনুভবের কৃত্রিম ও মিথ্যা অনুকরণে যৌন স্বেচ্ছাচার ধর্মীয় অনুমোদন পেয়েছিল, চৈতন্য-আশ্রিত ধর্মের সঙ্গে তান্ত্রিক কিছু আচারও মিশে গিয়েছিল, তবু তার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের আচার-আশ্রিতার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহও মিশে ছিল কয়েক শতাব্দী ধরেই। ধর্মচিন্তা, কাব্যচিন্তা, সমাজচিন্তা চৈতন্যের জীবনে যেন একটা আধার পেয়েছিল। চৈতন্যের আগেই রাধাকৃষ্ণ পদাবলি রচিত হত ও চৈতন্য নিজে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদ শুনতে ভালবাসতেন। কিন্তু চৈতন্য জীবনের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় পদাবলি সাহিত্যের যে স্ফূর্তি ঘটেছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। লিরিক কবিতা বাংলায় প্রধান একটি ধারা হিশেবে পুষ্ট হয়। চৈতন্য নিজেও সেই পদাবলির বিষয় হয়ে ওঠেন গৌরচন্দ্রিকা পদমালায় ও গৌরবিষয়ক পদাবলিতে। পদাবলি কীর্তন চৈতন্যের প্রতি ভক্তিতে এক মৌলিক মাত্রা পায় ও বাংলার সঙ্গীত

সম্পূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। কাতনের নানা ঢঙের মধ্যে উত্তর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে বাংলা গানের এক বিনিময় চলতে থাকে ও বাঙালি কীর্তনিয়ারা নিজস্ব আঙ্গিকে বিশিষ্ট সুর ও তাল সৃষ্টি করে তোলেন। কীর্তনভাঙা নানা গান উনিশ শতক পর্যন্ত চলে এসেছে। সমাজের অভিজাতশ্রেণী সব সময় এই কীর্তনভাঙা সঙ্গীত-আঙ্গিকগুলিকে প্রশ্রয় দেন নি, বিশেষত ইংরেজি সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কে আসার পর। কিন্তু এই আঙ্গিকগুলিকে আশ্রয় করে বাঙলার জনসংস্কৃতি অনেক দিন পর্যন্ত নিজেকে সৃষ্টিশীল রেখেছে।

চৈতন্যের আগেও বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম ছিল ও সেই ধর্মে যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁরা বৈষ্ণবব্রত ও উৎসব পালন করতেন। চৈতন্যের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম এমন ব্যাপকতা লাভ করে যে এই ব্রত ও উৎসবগুলি ব্যাপকতর তাৎপর্য পায় ও তাছাড়াও নতুন নতুন ব্রত ও উৎসব সৃষ্টি হতে থাকে - চন্দনযাত্রা, মাধবীপূর্ণিমা বা ফুলদোল, স্নানযাত্রা, গুরু পূর্ণিমা, চতুর্মাস্য, কামিকা একাদশী, ঝুলনযাত্রা, পবিত্রারোপণ, বলদেবের জন্মযাত্রা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, রাধাষ্টমী, উম্মিলনী মহাদ্বাদশী, ইন্দিরা একাদশী, বিজয়োৎসব, শারদ-রাসযাত্রা, গোবর্দ্ধনযাত্রা, গোপাষ্টমী, অক্ষয় নবমী, ভীষ্মপঞ্চমক, উত্থানৈকাদশী, রাসযাত্রা, পুষ্যাভিষেক যাত্রা, বসন্ত পঞ্চমী. অদ্বৈতসপ্তমী. ভৈমী একাদশী, নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী, মাঘী পূর্ণিমা, বসন্তোৎসব, গৌর পূর্ণিমা. দোলযাত্রা, পঞ্চমদোল, বলদেবের রাসযাত্রা ইত্যাদি। বাঙালি ভারতীয় জীবনের এমন সমূহ পরিবর্তন ঘটতে পেরেছিল চৈতন্যের ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। চৈতন্য ত মাত্র ৪৮ বৎসর বেঁচেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবৎকালেই তাঁর চাইতে বয়স্ক ও প্রতিষ্ঠিত ভক্ত ও পণ্ডিতগণ তাঁকে অবতারের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য ও অনুগামীদের মুখে মুখে ও কিছু রচনায় তার এই স্বল্পায়ু জীবন এক অন্য ধরণের মাহাত্ম্য অর্জন করেছে। তারপর সেই প্রত্যক্ষদর্শীদেরও মৃত্যুর পর পরবর্তীদের কাছে চৈতন্য প্রতীক হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে এই বিশ্বাস তাঁর পরবর্তীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যে-ঈশ্বরের জন্যে প্রত্যেকে প্রার্থনা করে, সেই ঈশ্বর চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সে আবির্ভাব কোনো কল্পনা নয়. কোনো দূর অতীতের ঘটনা নয়. মাত্র পঞ্চাশ, সত্তর, একশ, দুশ বছর আগে এ-ঘটনা ঘটেছিল। নবদ্বীপে-শান্তিপুরে তাঁর বসবাস ও যাতায়াতের স্থানগুলিকে নির্দিষ্ট করা যায়, পুরীতে তার বাসস্থান, তার গম্ভীরা এখনো দেখা যায়। ঈশ্বর এসেছিলেন ও সে - ঈশ্বর আমাদের মধ্যেই জীবনযাপন করে গেছেন - এই ধারণা চৈতন্য সম্পর্কে যুগ-যুগ ধরে এক গভীর বিশ্বস্ততা তৈরি করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় চৈতন্য কী উন্মাদনায় দাক্ষিণাত্যের তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেরিয়েছেন। এই তীর্থযাত্রায় চৈতন্য একা গিয়েছিলেন। তাঁর কোনো সঙ্গী ছিল না, কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণবালক ছাড়া। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে এ-বর্ণনা শোনেন নি। কিন্তু চৈতন্যের মৃত্যুর সত্তর-আশি বছর পর কৃষ্ণদাস যখন চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-তীর্থযাত্রা বর্ণনা করছিলেন তখন তিনি এ-রকমই কল্পনা করতে পারছিলেন

কথো দূর রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেই জন নিজ গ্রামে করয়ে গমন।
কৃষ্ণ বোলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে কৃষ্ণ নাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥
গ্রামান্তরে হৈতে দেখে আইসে যত জন।

তাহার দর্শন-কৃপায় হয় তার সম।।

সেই যাই নিজ গ্রাম বৈষ্ণব করয়।

অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়।।

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখন্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ, ১৯৫-২০৪ চরণ)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই বর্ণনার উৎস মুরারিগুপ্তের কড়চার দুটি শ্লোক। সেই শ্লোকের অনুবাদে কৃষ্ণদাস নিজের কল্পনা মিশিয়েছেন। কিন্তু মুরারিগুপ্তের কড়চা যদি চৈতন্যের জীবিতাবস্থায়ও লেখা হয়ে থাকে (সুকুমার সেন), বা তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লেখা হয়ে থাকে (বিমানবিহারী মজুমদার), আর মুরারিগুপ্ত চৈতন্যের সমসাময়িক পরিকর হলেও, মুরারিগুপ্তকে ত দাক্ষিণাত্য-তীর্থ-ভ্রমণের এই বিবরণ কল্পনা করে নিতে হয়েছে। মুরারিগুপ্ত থেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ পর্যন্ত প্রায় একশ বছর এই চৈতন্যকল্পনা আরো রিকশিত ও পল্লবিত হয়েছে। এই চৈতন্যকল্পনা চৈতন্যের ঈশ্বরত্বকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে ইংরেজের ভারতবিজয় পর্যন্ত বাস্তব করে তুলেছিল। ঈশ্বরকল্পনা চৈতন্যের চাইতে আর প্রামাণিক কোনো আধার পায় নি। এই ভাবে চৈতন্যকল্পনা ও ঈশ্বরকল্পনা এক হয়ে গেছে।

সেই কল্পনায় চৈতন্যের বাল্যলীলার সঙ্গে কৃষ্ণের বাল্যলীলা এক হয়ে গেছে। সেই কল্পনায় চৈতন্যের অন্তিম কৃষ্ণবিরহের সঙ্গে পৌরাণিক রাধাবিরহ এক হয়ে গেছে।

প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইঞা তার গুণ সঙরিয়া

মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।

রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি কহে হাহা হরি হরি

ধৈর্য গেল হইলা চপল।।

শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।

যার লোভে মোর মন ছাড়ি লোক বেদধর্ম

যোগী হঞা হইল ভিখারি।। ...

মন কৃষ্ণ বিয়োগী দুঃখে মন হৈল যোগী

সে বিয়োগে দশ দশা হয়।

সে দশায় ব্যাকুল হৈঞা মন গেল পলাইঞা

শূণ্য মোর শরীর আলয়।।

(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যখন্ড ১৪ পরিচ্ছেদ ৭৭-৮০ ও ১১২-১১৫ চরণ)

শতাব্দ-শতাব্দ ব্যাপ্ত এই ঈশ্বরকল্পনা ও চৈতন্যকল্পনার একাকারত্ব ঘটেছে চৈতন্যের বাস্তব জীবনকে আশ্রয় করেই। সেই বাস্তব জীবনে তাঁর জন্ম, তাঁর কর্ম, তাঁর বিবাহ, তাঁর সন্ন্যাস, তাঁর তীর্থ পরিক্রমা, তাঁর আত্মপরিক্রমা ও তাঁর জীবনাবসান ঐতিহাসিক সত্য।

তিন

চৈতন্যের জীবৎকালেই তাঁর ওপর দেবত্ব ও অবতারত্ব আরোপিত হয়েছে। পরবর্তীকালে রচিত চৈতন্যজীবনী-আখ্যান বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-এর সাক্ষ্য এ-বিষয়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 'চৈতন্য ভাগবত' রচিত হয়েছে ১৫৪৮

নাগাদ আর 'চৈতন্যচরিতামৃত' শেষ হয়েছে আনুমানিক ১৬১২ নাগাদ বা তার আগে। 'চৈতন্য ভাগবত'-এ যদি-বা চৈতন্যের জীবৎকালের সাক্ষ্য তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার আগেই চৈতন্য একটি কাহিনীতে বা মিথে পরিণত হয়েছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর রচয়িতা সেই মিথকে একটি বিশ্বাস্য কাব্যরূপ দিচ্ছিলেন মাত্র। 'চৈতন্য ভাগবত'-এর রচয়িতাও সেই মিথের দ্বারাই সীমাবদ্ধ ছিলেন। কারণ চৈতন্যসংক্রান্ত এই মিথ তৈরি হয়েছে তাঁর জীবৎকালেই।

চৈতন্যের জীবিতাবস্থায় এই মিথ কোনো একটা স্থির সাহিত্যরূপ পায় নি। তার কারণ অনেকে মনে করেন চৈতন্য নিজে এই ধরণের মিথ তৈরির বিরোধী ছিলেন (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড. পৃবার্ধ)। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে চৈতন্যের শারীরিক উপস্থিতির প্রবলতা কোনো সাহিত্যিক কল্পনা সৃষ্টির পক্ষে প্রধান বাধা ছিল। তৃতীয় আরো একটি কারণ হতে পারে চৈতন্যজীবনকে প্রত্যক্ষ করার মত অভাবিতপূব অভিজ্ঞতাকে রূপ দেয়ার যোগ্য কোনো সাহিত্যরূপ, (literary genre) তখন ছিল না।

চৈতন্যের জীবনের শেষ আঠার বছরে কোনো নাটকীয় ঘটনা ঘটে নি। তিনি পুরীতেই থাকতেন ও প্রায় একটা নিয়মের মধ্যেই জীবনযাপন করতেন। কিন্তু এই শেষ আঠার বছরেই প্রাচীনতর একটি মিথ - রাধাবিরহ তাঁর এই নিয়মিত জীবনযাপনের ভিতর এমন সত্য হয়ে ওঠে যে তাঁর প্রতিটি দিনই মিথ হয়ে উঠতে থাকে। চৈতন্য এই সময় ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণকথা বলে দিন কাটাতেন। সেই কথা বলতে বলতে তিনি প্রায়ই ভাববিহ্বল হয়ে পড়তেন, যখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকত না। সেই অবস্থায় তিনি কৃষ্ণকথা, ভাগবত, জয়দেব-চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ শুনতেন। এই দীর্ঘ আঠার বছরে চৈতন্য ক্রমেই যেন স্থায়ীভাবে জীবনমরণের অচিহ্নিত সীমানায় এক ঘোরের মধ্যে থাকতেন। সেই ঘোরের মধ্যেও তিনি কিন্তু রাধার কৃষ্ণবিরহের রূপকের আশ্রয়ে নিজের ঈশ্বরবিরহের যন্ত্রণা আস্বাদ করতে চাইতেন। এই অবস্থার যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী. যাঁরা তখন চৈতন্যের নিত্যসঙ্গী, তাঁরা এই বিস্ময়ের মধ্যেই তাঁদের দিন কাটাতেন - একটি মিথ কী করে জীবন পায়। তাঁবা নিজেবাও চৈতন্যের সহযোগী হিশেবে সেই মিথের নতুন জীবনলাভে সাহায্য করতে চাইতেন। কিন্তু চৈতন্যের বেলায় যা ছিল প্রত্যক্ষ অনুভবের সত্য, তাঁর অনুচরদের বেলায় সেটা ছিল চৈতন্যকে দেখে অনুভবের চেষ্টা ও কিছুটা অনুকরণের প্রয়াস। এই প্রক্রিয়ার ভিতরে চৈতন্যঅনুচরদের কারো পক্ষে সেই দূরত্ব রচনা করা সম্ভব হয় নি, যে দূরত্বে সমস্ত প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষক হিশেবে এই ঘটনার প্রাত্যহিকতা নথিভুক্ত করা যায়।

তাই চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের আগে নবদ্বীপে তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন ও সন্ন্যাস গ্রহণের পরে পুরীতে তাঁর কাছে যাঁরা ছিলেন বা তাঁর গৌড়দেশ ভ্রমণের সময়, বৃন্দাবন - কাশী - প্রয়াগ গমনের সময় যাঁরা তাঁর সঙ্গী ছিলেন. তাঁরা কেউ এই সব ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ লিখে রাখেন নি। বরং যাঁরা চৈতন্যের সঙ্গ পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন. যেমন সনাতন ও রূপ গোস্বামী, তাঁরা চৈতন্যের দেবত্ব ও অবতারত্বের একটা দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করার কাজে ব্যস্ত থেকেছেন। এঁদের এই চেষ্টার মধ্যে কখনো - কখনো প্রত্যক্ষদর্শার অভিজ্ঞতাও সঞ্চারিত হয়েছে। যেমন, বৃন্দাবনে ছয় গোস্বামীর চৈতন্য-রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব আলোচনার প্রত্যক্ষ উপাদান তাঁরা অনেক সময় পেয়েছেন রঘুনাথ দাসের মত ভক্তের কাছে যিনি চৈতন্যের সঙ্গে পুরীতে ষোল বছর ছিলেন ও চৈতন্যের মৃত্যুর পর বৃন্দাবনে চলে আসেন। রঘুনাথ দাসের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মত চৈতন্য - আখ্যানেরও প্রধান অবলম্বন।

চৈতন্যের জীবৎকালে তাঁর দেবত্ব যখন অন্তত তাঁর ভক্তমন্ডলীতে প্রতিষ্ঠিত তখনকার লেখাহিশেবে দুটি রচনার উল্লেখ চৈতন্যসংক্রান্ত পরবর্তী সব প্রামাণিক পুথিতে পাওয়া গেছে। চৈতন্যের নবদ্বীপপর্ব নিয়ে লেখা চৈতন্য সহচর মুরারিগুপ্তের কড়চা ও চৈতন্যের নীলাচলপর্ব নিয়ে লেখা চৈতন্য-অনুচর স্বরূপ দামোদরের কড়চা। কিন্তু এ-কোনো কড়চারই প্রামাণিক পাঠ পাওয়া যায় নি। পরবর্ত্তী চৈতন্য আখ্যানে এই দুটি কড়চা থেকে যা উদ্ধৃত হয়েছে, সেই অংশগুলিই এই কড়চাদুটির একমাত্র প্রামাণিক পাঠ। তাতেও বোঝা যায়, এই কড়চা দুটির কোনোটিতে কোনো আখ্যানের বিবরণ নেই কেবল কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে হয়ত। নবদ্বীপে চৈতন্যসহচর ও নীলাচলে চৈতন্য অনুচরদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিদ্যাচর্চায় আগ্রহী ও সাহিত্য রচনায় দক্ষ। তাঁরাও এই রকম একটি জীবন্ত বিষয় নিয়ে আখ্যান রচনা করতে পারেন নি। কিন্তু তখন যে - সাহিত্যরূপগুলি প্রচলিত ছিল ও সাহিত্যিক - দার্শনিক রচনায় যে সাহিত্যরূপের স্বীকৃতি ছিল অনেকে সেই সাহিত্যরূপ অবলম্বন করেছিলেন।

সে-কারণেই চৈতন্যকে নিয়ে লেখা আদি রচনাগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। সংস্কৃত ভাষায়, সংস্কৃতে প্রচলিত কোনো সাহিত্যরূপে লেখা রচনা আর বৈষ্ণবপদাবালর আকারে লেখা রচনা।

চৈতন্যের জীবৎকালেই রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে দুটি নাটক রচনা শেষ করেন - 'বিদগ্ধমাধব' ও 'লালতমাধব'। এই দুটি নাটক, একটি নাটক হিশেবে লেখা শুরু হয় পুরীতে, রূপ গোস্বামী যখন চৈতন্যের কাছে ছিলেন। চৈতন্যই তাঁকে একটি নাটকের মধ্যে কৃষ্ণকথাকে সীমাবদ্ধ না রেখে দুটি নাটকে ছড়িয়ে দিতে বলেন। এই নাটক দুটির বিষয় চৈতন্য নন, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী। কিন্তু নাটক রচনার মধ্য দিয়ে চৈতন্যের অবতারত্বের একটা দার্শনিক কারণের ভিত্তি তৈরি হচ্ছিল। চৈতন্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত হয় দুটি দার্শনিক গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'। এই দুটি বইই চৈতন্যপরবর্তী পদাবলি সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছে। ততদিনে চৈতন্য দার্শনিক ভারে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' অবতার হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর অবতারত্বের প্রধান কারণ হিশেবে এই তত্ত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে রাধার কৃষ্ণবিরহ আস্বাদ করার জন্যেই চৈতন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাধাকৃষ্ণ মিথ ও রাধাবিরহ চৈতন্যের জীবনের এই ব্যাখ্যায় নতুন প্রাণ পায়। 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' এই মিথের নতুন প্রাণসঞ্চারের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল।

এই মিথ যে চৈতন্যকে অবলম্বন করে নতুন প্রাণ পেতে পারে তারও একাট প্রধান কারণ ছিল পঞ্চদশ শতকের গৌড়বঙ্গে ভাগবত পুরাণের চর্চা। পুরাণ হিশেবে ভাগবত প্রাচীন নয়। পঞ্চদশ শতকেই গৌড়বঙ্গে ভাগবতচর্চা শুরু হয় ও কম সময়ের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে। ষোড়শ শতকে ভাগবত অন্যান্য পুরাণের চাইতে অনেকটা এগিয়ে যায়। ভাগরতের প্রথম অনুরাগীদের মধ্যে চৈতন্য অন্যতম। চৈতন্য-আন্দোলনের আশ্রয়ে ভাগবত-আন্দোলনও ছড়িয়ে পড়ে। সনাতন গোস্বামী এই ভাগবতের কাহিনীকেই সম্প্রসারিত করে বৃন্দারনে রসে 'বৃহৎভাগবতামৃত' লেখেন। সনাতন গোস্বামীর এই 'বৃহৎভাগবতামৃত' চৈতন্য আন্দোলনের একটা প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে কারণ এই গ্রন্থে প্রেমভক্তি সংকীর্তন, ব্রজলীলা, কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শাস্ত্রীয় মর্যাদা পেয়েছে। চৈতন্য তাঁর নিজের জীবন দিয়ে এই বিররণগুলির মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। সনাতন গোস্বামী চৈতন্য জীবনের সেই অভিজ্ঞতাকে পোরাণিক করে তুলছিলেন, নতুন মিথের অবলম্বন রাচত হচ্ছিল।

'বৃহৎভাগবতামৃত'-এর শুরুতে চৈতন্যের অবতারতত্ত্ব উত্থাপন করেছেন সনাতন গোস্বামী।

জয়তি নিজপদাব্জ প্রেমদানাবতীর্ণো
বিবিধ মধুরিমাক্তিঃ কোহপি কৈশোরগন্ধিঃ।
গত পরমদশান্তং যস্য চৈতন্যরূপাদ্
অনুভব পদমান্তং প্রেমগোপীষু নিত্যম।।

'যিনি নিজ পাদপদ্মে প্রেমদানের জন্যে অবতীর্ণ. যিনি বিবিধ মাধুযের আকর, যাঁহার পরমদশাপ্রাপ্ত চৈতন্যরূপ হইতে গোপীদের প্রেম নিত্য অনুভবের বিষয় হইতেছে. সেই কৈশোর মাধুর্যবান অনিবচনীয়ের জয় হোক' (সুকুমার সেন কৃত অনুবাদ)।

এই বন্দনাশ্লোকেই চৈতন্য যে কৃষ্ণস্বরূপ - তা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে ও তাঁর অবতারত্বের কারণ হিশেবে নির্দেশ করা হয়েছে গোপীপ্রেম আস্বাদন। রাধাপ্রেম বৈষ্ণব শাস্ত্রানুযায়ী গোপীপ্রেমেরই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। পরে চৈতন্য বন্দনার নির্দিষ্ট শ্লোকে সনাতন গোস্বামী স্পষ্টভাবে বলেছেন চৈতন্য স্বভাববশে স্বভক্তদের নিজভাবে কল্পনা করে লোভবশত ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন

স্বদয়িত নিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেন লোভাৎ।

জীবগোস্বামী চৈতন্যকে দেখেন নি বলেই ঐতিহাসিকরা মনে করেন। আনুমানিক ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধমের দাশনিক তত্ত্ব প্রধানত জীবগোস্বামীই রচনা করেছেন তাঁর ছাট সন্দভে ও আরো চারটি গ্রন্থে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভিত্তি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। এই রাধাতত্ত্ব বৃন্দাবনে জীবগোস্বামীই প্রাতষ্ঠা কবেন। তাঁর তত্ত্ব সন্দভ. ভগবৎ সন্দর্ভ, পরমার্থ সন্দভ, শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ, ভাক্ত সন্দভ, পরমাত্ম সন্দভ ও তার ভাগবতের টীকা.ব্রহ্মসংহিতার টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা ও উজ্জ্বলনীলমণির টীকা - গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি স্থায়ীভাবে তৈরি করে দিয়ে গেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধমের রাধাতত্ত্ব সম্পূর্ণতই চৈতন্যজীবনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। চৈতন্যজীবন নিরপেক্ষ রাধাতত্ত্বের কোনো ভিত্তি নেই। সেই চৈতন্যজীবনে দেবত্ব আরোপ শুরু হয় চৈতন্যের জীবনকালেই, বৃন্দাবনেব গোস্বামীরা সেই দেবত্বের দাশনিক ভিত্তি রচনা শুরু কবেন ও বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মধ্যেই রঘুনাথ দাসের মত চৈতন্যসহচর থেকে শুরু করে জীবগোস্বামীর মত চৈতন্য পরবর্তী গোস্বামীরা এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে সম্পূর্ণতা দেন। অথাৎ এই প্রায় একশ বছর ধরে চৈতন্যকে নিয়ে এই ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। চৈতন্যকে ভারতীয় দাশনিক ধারার অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে ও ভারতীয় বৈষ্ণব ধমচচার মধ্যে বিশিষ্ট এক ধারা হিশেবে চৈতন্য প্রবার্তত ধমকে স্থাপন করার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনকেন্দ্রিক এই দাশনিক চর্চার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। যদিও নবদ্বীপ ও নীলাচলই ছিল চৈতন্যের প্রধান দুইটি কর্মক্ষেত্র ও বৃন্দাবনে তিনি তীর্থদর্শনের প্রয়োজন ছাড়া কখনো যানও নি, তবু বৃন্দাবনকেই চৈতন্য বেছে নিয়েছিলেন তাঁর গৃহত্যাগী অনুগামীদের কর্মস্থল হিশেবে। বৃন্দাবন আবিষ্কার চৈতন্যের অন্যতম প্রধান কাত বলে স্বীকৃত। চৈতন্য নিজে কোনো ধর্মমত প্রচারও করেন নি, প্রতিষ্ঠাও করেন নি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বলে যে-ধর্মমত পররতী কালে প্রচারিত হয়েছে তারও নানা রকমফের আছে। রাংলাদেশেরও এই ধর্মমতের প্রকারভেদ আছে। তবু বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দাশনিক প্রস্থানের মাধ্যমেই হিন্দু ধর্মমতগুলির মধ্যে ও বিশেষত বৈষ্ণব ধর্মমতগুলির মধ্যে চৈতন্যের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। সেই সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত অর্জনের জন্যেই বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সংস্কৃত ভাষাতেই তাঁদের র‍্যাখ্যা বিশ্লেষণ রচনা করেছেন। এহ র‍্যাখ্যা-

বিশ্লেষণগুলি যে একটি কোনো নির্দিষ্ট আকার বা রূপে (form) লিখিত হয়েছে, তাও নয়। রূপ গোস্বামী নাটক লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন। জীব গোস্বামী সন্দর্ভ লিখেছেন, টীকা লিখেছেন, কাব্য লিখেছেন।

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যে-প্রায় আশি বছর ধরে এই রাধাকৃষ্ণ সাহিত্য ও পরোক্ষ চৈতন্য পুরাণ রচনা করেছেন সেই সময়ের মধ্যে বাংলা দেশেও সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যকে নিয়ে মহাকাব্য ও নাটক লেখা হয়েছে। কবি কর্ণপুর পরমানন্দ দাস ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের আগেই 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক ও ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য লিখেছেন। দশ অঙ্কের নাটকে প্রথম থেকেই চৈতন্যের অবতার হিশেবে আবির্ভাব। সন্ন্যাসপরিগ্রহ, অদ্বৈতপুরাবলাস, সার্বভৌমানুগ্রহ, তীর্থাটন, প্রতাপরুদ্রানুগ্রহ - চৈতন্য জীবনের এই সব বিশিষ্ট পরিচিত ও বহুল প্রচারিত ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর অবতারত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্যের উদ্দেশ্যও একই। কিন্তু নাটকে সংলাপের ওপরই একমাত্র নির্ভর বলে এই অবতারের বিবরণ নাটকের ঘটনাতে বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। মহাকাব্যে এই ধরণের কোনো বাধার আশঙ্কা নেই। সেখানে চৈতন্যের জীবনের ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণ ও তাঁর অবতারত্বের কালাতিক্রমী বিবরণ একই সঙ্গে জায়গা পেয়েছে।

চৈতন্যকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতে যে-কাব্য, নাটক, রসশাস্ত্র বা টীকা লেখা হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতে প্রচলিত রচনার নানা ধরণের (form) সঙ্গে চৈতন্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বা অনুভবের সঙ্গতি তৈরি করা। চৈতন্যের জীবনই যেহেতু ছিল এই সব রচনার প্রেরণা, তাই এই সব রচনাতে রচনাকারের অনুভবও ছড়িয়ে আছে। কিন্তু চৈতন্যজীবনকে সংস্কৃত রসশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র ও পৌরাণিকতার ভিতর স্থাপন করাই ছিল যেহেতু এই সব রচনার প্রধান উদ্দেশ্য তাই এই সব রচনাতে অনুভবের চাইতেও যুক্তিপরম্পরা ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার চৈতন্যআশ্রয়ী নতুনত্বই ছিল মুখ্য। রচনাকাররা প্রত্যেকেই ছিলেন চৈতন্যের জীবনমুগ্ধ ভক্ত। তাঁদের কেউ-কেউ কোনো কোনো সময়ে চৈতন্যের সঙ্গও পেয়েছেন। অথচ সেই মুগ্ধতা ও সঙ্গলাভের ফলে তাঁরা তাঁদের পাণ্ডিত্য ত্যাগ করেন নি, বরং তাঁদের অনেকেই ছিলেন নিজ-নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তাই চৈতন্য আশ্রয়ী এই সব সংস্কৃত রচনায় চৈতন্য-জীবনের কোনো নতুন আখ্যান নির্মিত হতে পারে নি। তাঁরা চৈতন্য-জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে অবলম্বন করেছেন, সেই ঘটনাকে তাঁরা এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে চৈতন্যের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় আর তা করতে গিয়ে রচনাগুলিকে যতটা সম্ভব পরম্পরাগত সাহিত্যরূপের মধ্যেই তাঁদের সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। চৈতন্যআশ্রয়ী সংস্কৃত রচনা চৈতন্যজীবনের আখ্যান যেমন নির্মাণ করতে পারে নি, তেমনি সেই প্রয়োজনে কোনো নতুন সাহিত্যরূপও তৈরি করে তুলতে পারে নি।

অন্যদিকে চৈতন্যের সঙ্গে যাঁরা নবদ্বীপে ও নীলাচলে ছিলেন তাঁরা চৈতন্যের ভগবত্তায় বিশ্বাসের জন্যে কোনো প্রমাণের অপেক্ষা করেন নি। এমন প্রমাণের কোনো প্রয়োজন বৃন্দাবনের গোস্বামীদেরও ছিল না কিন্তু তাদের একটা অন্য দায় ছিল; সেই দায় মেটাতেই তাঁরা প্রমাণের আকারে চৈতন্য জীবনের তথ্যকে বিন্যস্ত করেছেন। নবদ্বীপ ও নীলাচলে চৈতন্যের সঙ্গীদের তেমন কোনো দায়ও ছিল না কিন্তু তাঁদের মধ্যেও অনেকে চেয়েছেন চৈতন্য সম্পর্কিত অনুভবকে শব্দে গাঁথতে। নবদ্বীপ থেকে চৈতন্য সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাওয়ার ফলে নবদ্বীপের ভক্তদের কাছে চৈতন্যবিরহ হয়ে ওঠে একটি বাস্তব ঘটনা। আবার নবদ্বীপে ও নীলাচলে প্রতিদিন চৈতন্যের দেখা পাওয়াও ছিল সেই ভক্তদের কাছে প্রতিদিনের বাস্তব ঘটনা যাকে তাঁরা অবাস্তবে উত্তীর্ণ করতে চাইতেন। তাঁরা জয়দেব - চণ্ডীদাস - বিদ্যাপতির পদাবলিতে সাহিত্যের সেই ধরণটি (form)

পেয়েছিলেন যার আয়তনে চৈতন্যজীবন সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে তাঁরা সাজিয়ে নিতে পেরেছিলেন। সেখানেও নতুন কোনো সাহিত্যরূপ তৈরি হল না। পরম্পরাগত একটি সাহিত্যরূপের ভিতরে তাঁরা এই নতুন বিষয়টি সন্নিবেশ করলেন।

চার

বৃন্দাবনে যে প্রায় আশি বছর জুড়ে চৈতন্যের দার্শনিক তত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সংস্কৃত নাটকে, সন্দর্ভে, নিবন্ধে ও টীকায় বৃন্দাবনের গোস্বামীরা প্রতিষ্ঠা করছিলেন, তখন বাংলাদেশে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ সহচর - অনুচরদের মধ্যে কেউ-কেউ, আবার তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে অনেকে বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করছিলেন ও তাঁদের কোনো-কোনো রচনার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব-পদাবলিতে গৌরপদাবলি বলে নতুন একটি শাখা সন্নিবেশিত হচ্ছিল। এই শাখা থেকেই পরবর্তীকালে পালাকীর্তনের আবশ্যিক অঙ্গ হিশেবে গৌরচন্দ্রিকার সূত্রপাত। বাংলাদেশে পদাবলি কীর্তনের শুরুই হয়েছে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রেরণায়, তার নবদ্বীপ পর্বে ও নীলাচল পর্বে। সন্ন্যাসগ্রহণের আগে ও পরে, গৌড় গমনাগমনের পথে, নীলাচলে চৈতন্য পদাবলি গান শুনতেন। সেই পদাবলি গানগুলো থেকেই চৈতন্যের সহচর ও অনুচরগণ কৃষ্ণের প্রেমলীলার মুখ্য পাত্রী হিশেবে রাধার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে নেন। চৈতন্যের সমকালীন নব্যপুরাণ ভাগবতে কৃষ্ণের নায়িকা রাধা নন, রাধাকে নিয়ে কোনো পুরাণও নেই, কিন্তু চৈতন্য একই সঙ্গে ভাগবতকে আশ্রয় করেছেন কারণ ভাগবত কৃষ্ণের কাহিনী ও সেই কৃষ্ণকাহিনীতে রাধার জন্যে তিনি উচ্চতম স্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন। তার ফলে ভাগবত-এ নতুনতর আখ্যান সংযোজিত হচ্ছিল। এমনকী ধর্মসম্পর্কহীন প্রচলিত প্রেমকাব্যকেও চৈতন্য তাঁর ধর্মোন্মাদনার বিষয় হিশেবে ব্যবহার করেছিলেন। এ-রকম একটি শ্লোক চৈতন্যের অনুষঙ্গেই বিখ্যাত হয়ে আছে, 'য়ঃ কৌমারহর ...'। এই সব পদাবলির মধ্য দিয়ে এক নতুন ধরণের রাধাকৃষ্ণ বিবরণ সংগঠিত হচ্ছিল।

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যখন সংস্কৃত ভাষায় নাটকে - আখ্যা - সন্দর্ভ - নিবন্ধে ভারতীয় ধর্মসাধনায় চৈতন্যের জন্যে একটি নির্দিষ্ট স্থান রচনা করছিলেন আর তার ভিতর দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল, বাংলাদেশে তখন বাংলাভাষায় রচিত এই পদাবলির মধ্য দিয়ে চৈতন্যের এক ধরণের লোকায়ত প্রতিষ্ঠা ঘটছিল। এখানেও বিষয় রাধাকৃষ্ণ, এখানেও বিষয় মধুর রতি, এখানেও বিষয় পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ। কিন্তু এই পদাবলির মধ্য দিয়ে যে-বিবরণ তৈরি হচ্ছিল তা অনেকখানি লোকায়ত বিবরণ, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনা সে-ক্ষেত্রে অনেকটাই ক্লাসিক বিবরণ। চৈতন্যের জীবনে শাস্ত্রানুমোদিত ও আচারপ্রধান ধর্মের প্রভাব ছিল না। তিনি সেখানে সঞ্চার করেছিলেন শাস্ত্রের বাইরের এক ধর্মীয় আবেগ। যে-কৃষ্ণকাহিনী বৃন্দাবনে রচিত হচ্ছিল, তারও ভিত্তিতে ছিল রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে এক আবেগ। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত বলে ও এই সব রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচলিত নাটক, কাব্য, টীকা, সন্দর্ভ প্রভৃতি রচনার ধরণ অনুসরণের বাধ্যতা ছিল বলে রাধাকৃষ্ণের কাহিনীও সেখানে নতুন কোনো সাহিত্যরূপের জন্ম দেয় নি।

চৈতন্যকে নিয়ে লেখা তাঁর সমসাময়িকদের গৌরবিষয়ক পদাবলিও কোনো নতুন সাহিত্যরূপের জন্ম দিল না, বরং, পদাবলি ধারাতেই একটি নতুন বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটাল। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ ঘটনার এমন কাব্যরূপ দেয়ার চেষ্টা হয় নি, জীবিত কোনো ব্যক্তিকে নিয়েও এ-রকম কবিতা লেখার চেষ্টা হয় নি। এর ফলে গৌরবিষয়ক কবিতায় বিবরণের এমন এক প্রত্যক্ষতা এল যাতে একটা কাহিনীর অবয়ব দেখা গেল। এ-রকম কাহিনীর অবয়ব রাধাকৃষ্ণ পদাবলির প্রধান বৈশিষ্ট্য - সেখানেও কাহিনী বিস্তারিত হয় না, আভাসিত হয় মাত্র।

চৈতন্যের মৃত্যুর পর আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত কাহিনী নিয়ে পালাবন্দি কীর্তন গান প্রচলিত হয়। এই পালাকীর্তনগুলি গাওয়া আরম্ভ হত গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে। অর্থাৎ শুরুতে রাধাকৃষ্ণ পদাবলি ও গৌরবিষয়ক পদাবলির যে স্বাতন্ত্র্য ছিল, পরবর্তী কালে তা ঘুচে যায় ও এই দুই ধরণের পদাবলি একই ছকের মধ্যে পরস্পরের সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। চৈতন্যের আচরণ ও তাঁর বিশেষ-বিশেষ প্রবণতাই ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রাধাকৃষ্ণ পদাবলিকে এমন ব্যাপক চর্চার বিষয় করে তুলেছিল। আবার অন্যদিকে, চৈতন্যের মৃত্যুর পর রাধাকৃষ্ণ আখ্যানের বিশেষ-বিশেষ অংশের সঙ্গে মিল রেখে সঙ্গতিপূর্ণ চৈতন্যবিষয়ক পদাবলি রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। রাধাবিরহ ও চৈতন্যবিরহ একই আখ্যানের অন্তর্গত হয়ে যায়।

গোবিন্দ ঘোষ তাঁর আরো দুই ভাইকে নিয়ে নবদ্বীপে চৈতন্যের অনুগামী হয়েছিলেন। তাঁর দুইটি পদে চৈতন্যের জীবনের একটি ঘটনা এমন ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে যাতে আখ্যানের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম পদটি চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প জানার পর লেখা

প্রাণের মুকুন্দ হে কি আজি শুনিলু আচম্বিত
কহিতে পরান যায় মুখে নাহি বাহিরায়
শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ।।
ইহাও না জানি মোরা সকালে মিলিলুঁ গোরা
অবনত মাথে আছে বসি।
নিঝরে নয়নে ঝরে বুক বাহি ধারা পড়ে
মলিন হৈয়াছে মুখশশী।।
দেখিয়া তখান প্রাণ সদা করে আনছান
সুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষনেকে সম্বিত হৈল তবে মুঞি নিবেদিল
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর।।
আমি ত বিবশ হৈয়া তারে কিছু না কহিয়া
ধাইয়া আইলুঁ তুয়া পাশ।
এই ত কহিলুঁ আমি যে - করিতে পার তুমি
মোর নাহি জীবনের আশ।।
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে
গদাধরের বদন হেরিয়া।
এ গোবিন্দ ঘোষে কয় ইহা যেন নাহি হয়
তবে মুঞি যাইমু মরিয়া।।

দ্বিতীয় পদটি সন্ন্যাস গ্রহণের পর লেখা।

হেদে রে নদীয়বাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও।।

তো সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে।।
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
পরান পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।।
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্তনবিলাস।।

এই পদ দুইটিতে রাধকৃষ্ণ পদাবলির আদলটি নির্ভুলভাবে চেনা যায়। প্রথম পদে কবিকে এমন-কি 'মিলিলুঁ', 'তুয়া', 'দহিলুঁ' - এই ধরণের ব্রজবুলির সাহায্যও নিতে হয়েছে। তা ছাড়া, 'আজি কি শুনিলু আচম্বিত', 'মলিন হৈয়াছে মুখশশী', 'আমি ত বিবশ হৈয়া', 'মোর নাহি জীবনের আশ' - এই ধরণের শব্দবন্ধও বৈষ্ণব পদাবলি থেকেই নেয়া। দ্বিতীয় পদটিতেও বৈষ্ণব পদাবলিতে কৃষ্ণের মথুরাগমন নিয়ে লেখা পদের ছায়া আছে। কিন্তু একাট প্রচলিত ছকের আশ্রয়ে কবি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাব্যরূপ দিচ্ছিলেন সেটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। এই প্রত্যক্ষতাই প্রথম যুগে চৈতন্যের সমসাময়িকদের লেখা পদাবলিকে বিশিষ্ট করেছিল, যদিও সে বিশিষ্টতা বৈষ্ণবপদাবলি থেকে স্বতন্ত্র কোনো সাহিত্যরূপকে আকার দেয় নি।

বরং গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি দুই বিপরীত দিকে পরবর্তী সময়ে এগিয়েছে। একদিকে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদের সঙ্গে মিশে গিয়ে পদাবলির ছকটিকেই স্পষ্ট করছিল, গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের বিশিষ্টতা কমে আসছিল। আবার উল্টোদিকে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের বৈশিষ্ট্যগুলি এই প্রায় একশ বছর ধরে আখ্যানের এমন একটি ভাষা পদাবলি সাহিত্যের মধ্যেই তৈরি করছিল, যে, চৈতন্য জীবনের আখ্যানসাহিত্য যখন স্বতন্ত্র ভাবে নির্মিত হল, তখন, তাতে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলির এই কাব্যরীতি অনেকটাই গৃহীত হল।

এখানে শুধু এহটুকুই বলে রাখা দরকাব চৈতন্যআখ্যান নির্মাণে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি অন্যতম উপাদান হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় এক শতকে ছড়ানো একটি প্রক্রিয়ায়। এ-রকম ভাবা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে অযৌক্তিক হবে যে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলিই কালক্রমে একটা বৃহত্তর আখ্যানে সমাবিষ্ট হয়ে চৈতন্যআখ্যান রচনা করেছে।

এখানে আমরা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলির বিকাশের প্রথম প্রক্রিয়াটির আরো কিছু উদাহরণ নেব যেখানে বৈষ্ণবপদাবলির ছাচের মধ্যে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলি মিশে গেছে আবার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলির ওপর গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলির প্রভাব পড়েছে।

চৈতন্যের প্রথম অনুচরদের অন্যতম মুরারিগুপ্তই পদাবলির নতুন চর্চা শুরু করেন। তাঁর একটি পদে প্রেমিকা রাধার যে সর্বস্বহারা দুঃসাহসের কথা বলা হয়েছে তাতে জীবনের শেষ পর্যায়ে চৈতন্যের আত্মবিলাপ ও আত্মবিসর্জনের কাতরতার প্রত্যক্ষ প্রেরণা পাঠ করা যায়।

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও।
নয়ন পুতলী করি লইলোঁ মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে কবি প্রাণ

পিরীতি আগুন জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি-কুল-শীল অভিমান।
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে
স্রোতবিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে।
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমনি হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায়।।

চৈতন্যের আর-একজন প্রত্যক্ষ অনুচর ছিলেন মুকুন্দ দত্ত। তিনি চৈতন্যের সঙ্গে একই টোলে পড়েছেন। মুকুন্দের সঙ্গে চৈতন্যের ছিল প্রিয় বন্ধুর সম্পর্ক। চৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণের পর মুকুন্দ অদ্বৈতের বিলাপ নিয়ে একটি পদ রচনা করেন। প্রত্যক্ষতা এত বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেই পদটিও যেন রাধাবিরহের পদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। সেই ঐক্যের টানেই মুকুন্দ চৈতন্যকে 'গোপীনাথ' বলে সম্বোধন করেছেন।

আরে আমার গৌরাঙ্গ গোপীনাথ
যাহার লাগিয়ে গেহ গুরু ছোড়নু
সেহি করল পরমাদ।
অপরূপ বেশ কেশ সব মুন্ডন
উপন্ধন অরুণ কৌপীন
যো পঁহু ত্রিভুবন রস - উল্লসিত
সেহি বেশ সন্ন্যাস প্রবীণ।
ঞিহা গুণ সোঙরি রোয়ত শান্তিপুর-নাথ
যব পঁহু নীলাচলে যাই
হেরিতে প্রেম অঙ্গ মুকুন্দ মন ভুলল
লগাও ত লোক বুঝাই।

রাসুদের দত্তের একটি পদে কৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রায় যশোদার মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে

দন্ডে শতবার খায় যাহা দেখে তাহা চায়
ছানা দাধ এ ক্ষীর নবনী
রাখিও আপন কাছে ভোখছানি লাগে পাছে
আমার সোনার যাদুমণি।
শুন রাপু হলধর এক নিবেদন মোর

এই গোপাল মায়ের পরাণ
যাইতে তোমার সনে সাধ করিয়াছে মনে
আপনি হইও সাবধান।
দামলিয়া যাদু মোর না জানে আপন-পর
ভালো-মন্দ নাহিক খেয়াল
দারুণ কংসের চর তারা ফিরে নিরন্তর
আপনি হইও সাবধান।
বাম করে হলধর দক্ষিণ করে গিরিধর
শুন বলাই নিবেদন বাণী
বাসুদেবদাস বলে তিতিল বয়ান জলে
মুরছিয়া পড়িল ধরণী।।

বাসুদেব ঘোষ চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার সঙ্গী ছিলেন। তাঁর আরো দুই ভাইও, গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ, সারা জীবন চৈতন্যের অনুগামী ছিলেন। বাসুদেব ঘোষ চৈতন্যের বাল্যলীলা বিষয়ক যে পদ লিখেছিলেন তাতে কৃষ্ণের বাল্যলীলা মিশে গেছে।

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।
শচী বলে বিশ্বম্ভর, আমি না হেরিনু
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু
মায়েব অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে।
বাসুদের ঘোষ বলে অপরূপ শোভা
শিশুরূপ দেখি হয় জগ-মন-লোভা।।

উদাহরণ আরো বাড়ানো যায়। এমন উদাহরণও বেষ্ণব পদাবালতে খুব বিরল নয় যেখানে চৈতন্যের ওপর কৃষ্ণত্ব আরোপ করা হয়েছে এক কৃত্রিম ছকে। এগুলো ঘটেছে পরবর্তীকালে গৌরচন্দ্রিকা যখন পালাকীর্তনের একটি আবশ্যিক আচার হয়ে ওঠে। আমরা দেখতে চাইছি পদাবলি সাহিত্যের সেই বৈশিষ্ট্যটুকু যেখানে চৈতন্যকে নিয়ে কৃষ্ণকথার আশ্রয় ও রাধাবিবহের ছায়ায় এক স্বতন্ত্র আখ্যান ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে গড়ে উঠেছিল।

পাঁচ

বিষয় হিশেবে চৈতন্যের অভিনবত্ব আধগত হওয়া সত্ত্বেও সেই অভিনবত্বের আধার হতে পারে এমন সাহিত্যরূপের দিকে চৈতন্যবিষয়ক লেখকবা দীর্ঘ এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগচ্ছিলেন। তাঁরা কখনো সংস্কৃত কাব্যে-নাট্যে, কখনো পদাবলিতে তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ চৈতন্যের জন্যে একটি সাহিত্যরূপ খুঁজছিলেন। বিষয় হিশেবে চৈতন্যের অভিনবত্ব ছিল এইখানে যে তাঁকে প্রত্যক্ষ ভারে দেখা গিয়েছে, তাঁর প্রতিটি দিন অসংখ্য মানুষেব চোখের সামনে যাপিত হয়েছে, তাঁর

জীবনের প্রায় প্রতিটি ঘটনার একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী আছেন - একমাত্র দাক্ষিণাত্যভ্রমণের মত ঘটনা ছাড়া. তাঁর জীবিতাবস্থাতেই একবার নবদ্বীপে, আর একবার পুরীতে অদ্বৈত আচার্য তাঁকে দেবত্বে অভিষিক্ত করেছেন। যাঁরা তাকে দেখেন নি তাঁরাও তাঁর কথা শুনেছেন। তাঁর জীবনকালেই চৈতন্য লোকশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর মৃত্যুর পরে জন্মেছেন তাঁদের কাছেও এই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও লোকশ্রুতি একসঙ্গে পৌঁছেছে। অভিজ্ঞতার এই প্রত্যক্ষতা ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতারও এই তীব্রতা ধারণ করার মত সাহিত্যরূপ একবারে একটি রচনার মধ্যে দিয়ে তৈরি হতে পারে না। এমনকী বিষয় হিশেবে চৈতন্যের আয়তন ও মাত্রাও স্থির ছিল না। মুরারি গুপ্তের কড়চার সঙ্গে কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' - এর তুলনা প্রসঙ্গে বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছিলেন কত দ্রুত সেই চৈতন্যবিষয়ের কত পবিবর্তন হয়েছে - 'এই সব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বৎসরের মধ্যেই কি ভাবে চৈতন্যচরিতে সংযোজন-সংশোধন-প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই প্রক্রিয়াব রূপ কেমন হইয়াছিল তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজেব রচনার সহিত আবার করি কর্ণপুরের রচনা মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যাইবে' (বিমানবিহারী মজুমদার. শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃ. ১০০)।

এই প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চৈতন্য সম্পর্কে ধারণার রূপান্তর, চৈতন্য বিষয়ের পবিবর্তন ও চৈতন্যবিষয়ের যোগ্য আধারের অচেতন অন্বেষণ। ঐতিহাসিকবা সকলেই এ-বিষয়ে একমত না হলেও আমরা এই তথ্যটিই মেনে নিচ্ছি যে মুরারিগুপ্তের কড়চা ও কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য কম সময়ের ব্যবধানে লেখা, দুটি রচনাব মধ্যে বড় জোর সাত-আট বৎসরের দূরত্ব। অন্য তথ্য অনুযায়ী এই ব্যবধান বিশ বাইশ বছরেরও হতে পারে। দুটি বচনার মধ্যে একটি বড় তফাৎ, মুরারিগুপ্ত চৈতন্যের চাইতে বয়সে বড় ও একই টোলে পড়াশোনা করেছেন, তারপর মুরারি নবদ্বীপে চৈতন্যের প্রথম অনুগামীদের অন্যতম. নীলাচলেও তিনি অনেকবার গেছেন ও চৈতন্যের প্রত্যক্ষ অনুগামীদের সম্মতিতেই রা অনুরোধেই তিনি চৈতন্যের জীবনীর এই রূপরেখা তৈরি করেন। অন্যদিকে, করি কণপূর নেহাৎ বালক বয়সে তাঁব বাবা শিবানন্দ সেনের সঙ্গে পুরীতে গিয়ে চৈতন্যকে দেখেছেন ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য রচনায় তাঁকে পরোক্ষ উৎসের ওপব নির্ভর করতে হয়েছে বেশি। কবি কর্ণপুর তাঁব 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্যের প্রথম আট সর্গ ও একাদশ সগ মুরারিগুপ্তের কড়চা অনুসরণ করে লিখেছেন। বিমানবিহারী মজুমদার একটি দীর্ঘ তালিকা তোর করেছেন যে কবি কণপূর কোন কোন অংশে আবকল মুরারিগুপ্তকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সে তালিকায় দুটি গ্রন্থের আংশিক অরিকলতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও এই দুটি গ্রন্থের পার্থক্যেব কথা যেখানে আলোচিত হয়েছে সেখানেই আমবা বুঝতে পারি মাত্র আট-দশ বৎসরেব মধ্যে চৈতন্যবিষয়ের কী পরিবর্তন হচ্ছিল।

মুরারিগুপ্তের রচনায় অদ্বৈতের সঙ্গে চৈতন্য দেখা করতে গিয়েছিলেন। করি কর্ণপুরের গ্রন্থে অদ্বৈতই চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মুরারিগুপ্ত চৈতন্যের গর্ভবাসের কথা লেখেন নি। কবি কর্ণপূর লিখেছেন চেতন্য তের মাস গর্ভে ছিলেন। চৈতন্যের জন্ম উপলক্ষে তাঁর বারা জগন্নাথ মিশ্র মুরারিগুপ্তের বণনানুযায়ী পান, চন্দন, মালা ও গন্ধ বিতবণ করেছিলেন। কবি কর্ণপুরের বর্ণনায় জনগন্নাথ মিশ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে এত ধনরত্ন বিলি করেছিলেন যার পরিমাণ নির্ণয় কবা যায় না। কবি কর্ণপূর শিশু চৈতন্যের গায়ে 'প্রবাল-মুক্তা মণিহার, মনোজ্ঞ কঙ্কন, কিঙ্কিনী'র বর্ণনা দিয়েছেন। মুরাবি গুপ্ত লিখেছেন নিমাই একদিন শুকনো কাঠি দিয়ে বন্ধুকে মেরেছিলেন। কবি কর্ণপুরের হাতে সেটা হয়ে উঠেছে নরপল্লব। মুরারিগুপ্ত লিখেছেন নিমাই একদিন তাঁর মা শচীদেবীকে 'মুঢ়ে' রলে ডেকেছিলেন। কবি কর্ণপূর এই প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন। চৈতন্য গয়া থেকে

ফিরে এসে মাকে প্রণাম করলে কবি কর্ণপুরের বর্ণনায় আকাশে কাঁসি, বাঁশি, বীণা ও মুরজ বেজে ওঠার কথা আছে। মুরারি গুপ্তে এ-রকম কোনো ঘটনা নেই। কাব কর্ণপুরের রচনায় শচী দেবী ব্রাহ্মণ, নর্তক ও বাদকদের মধ্যে দু হাতে টাকাপয়সা বিলিয়ে দিলেন। মুরারিগুপ্তে এ-রকম কোনো ঘটনা নেই। মুরারিগুপ্ত বলেছেন চৈতন্য একদিন তাঁর অনুচরদের নিয়ে বাটা ও কোদাল হাতে একটি মন্দির পবিষ্কার করেছিলেন। কবি কর্ণপুর এই ঘটনাটি বাদ দিয়েছেন।

মুরারিগুপ্তের কড়চার সঙ্গে কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' (১৫৪২) রচনা কালের পার্থক্য যদি সাত-আট বৎসর বা বিশ-বাইশ বৎসর হয় তাহলে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'-এর রচনা (১৫৪৬-১৫৫০) কালের সঙ্গে মুরারি গুপ্তের পার্থক্য পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বা দশ থেকে পনের বছর। বৃন্দাবন দাসও মুরারিগুপ্তের কড়চার ওপর নির্ভর করেছেন ও তাঁর বইয়ে চৈতন্য জীবনের পর্বভাগ করেছেন মুরারিগুপ্তকে অনুসরণ করে। বিমানবিহারী মজুমদার মুরারিগুপ্তের কড়চার সঙ্গে 'চৈতন্য ভাগবত'-এর যে-তুলনা করেছেন তা থেকেও একটি তালিকা তৈরি করা যায়। সেই তালিকাতেও আমরা দেখব কাব কর্ণপুর মুরারিগুপ্তকে যেভাবে অনুসরণ করেছিলেন, বৃন্দাবনদাসের অনুসরণে তা থেকে কোনো পার্থক্য ছিল কী না।

শিশু নিমাই বাড়িতে এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে যখন যেতেন তখন নূপুরের আওয়াজ শোনা যেত - একথা মুরারিগুপ্তও বলেছেন, বৃন্দাবনদাসও বলেছেন। বৃন্দাবনদাস তার সঙ্গে যোগ করেছেন নিমাই যেখানে-যেখানে পা ফেলতেন সেখানে-সেখানে ধ্বজ, বজ্র, পতাকা, অঙ্কুশ এই সব চিহ্ন দেখা যেত। মুরারিগুপ্ত বলেছেন, বিশ্বম্ভর অর্থোপার্জনের জন্যে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাস এ-কথা উল্লেখও করেন নি, তিনি বলেছেন 'ইচ্ছাময় ভগবান' - এর বঙ্গদেশ দেখার ইচ্ছে হল। বৃন্দাবনদাসে আরো আছে যে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণরা এসে বিশ্বম্ভরকে বলেন তাঁর রচিত 'টিপ্পনী' 'লই পড়ি পড়াই'। শিশু নিমাই অশুচিস্থানে বসে মাকে খাপরা ছুঁড়ে মারছেন - এই ঘটনা মুরারিগুপ্তে আছে, বৃন্দাবনদাসে নেই। মুরারিগুপ্ত বিশ্বম্ভরের প্রথম আবেশ বর্ণনা করেছেন ও আবেশের কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। বৃন্দাবনদাসের নিমাই জন্ম থেকেই সচেতনভাবে নিজের ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করেন, তাঁর বেলায় ক্ষণিক আবেশ প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। বৃন্দাবনদাস এই ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হিশেবে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন - দুই চোরের কাহিনী, ঘরে কিছু নেই শুনে মাকে নিমাই দুই তোলা সোনা দিলেন এবং বারেবারেই এ-বকম সোনা দিতে থাকলেন, শ্রীরাসের মৃত পুত্রের সঙ্গে বিশ্বম্ভরের কথোপকথন, মুরারিগুপ্তের দেয়া নৈবেদ্য খেয়ে চৈতন্যের অজীর্ণ ও মুরারিগুপ্তের দেয়া জল খেয়ে নিবাময়, মুরারি গরুড় সেজে চতুর্ভুজ বিশ্বম্ভরকে কাঁধে তুলে নিলেন, গঙ্গাতীবে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বিশ্বম্ভর তর্কে হারালেন ও দিগ্বিজয়ী স্বপ্নে জানতে পারলেন চৈতন্য স্বয়ং ভগবান, সঙ্কীর্তন নিষিদ্ধ করায় চৈতন্য বিরাট সংকীর্তন বাহিনী নিয়ে কাজিদলন করলেন - সেই সঙ্কীর্তনে নাকি মুরারি গুপ্তও ছিলেন কিন্তু মুরারিগুপ্ত এ-রকম কোনো ঘটনা উল্লেখও করেন নি।

মুরারিগুপ্তের কড়চাকেই উৎস ধরে আর - একটি চৈতন্যজীবনী আখ্যান রচিত হয়েছিল - লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'। এই বইটিতে চৈতন্যতত্ত্ব বা গৌড়ীয় বেষ্ণবধমের তত্ত্ব খুব স্পষ্টভাবে বলা হয় নি কিন্তু এমন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে সেই তত্ত্ব মহন্তদের মধ্যে তখন আলোচিত হচ্ছে। চৈতন্যতত্ত্ব বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই লোচনের কাব্য বচিত বলে এই কাব্যে চৈতন্যের জীবনের প্রত্যক্ষতা তত্ত্বের নীচে চাপা পড়ে নি। লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল' সূত্রখন্ড, আদিখন্ড, মধ্যখন্ড ও শেষখন্ড এই চার ভাগে সম্পূর্ণ। সূত্রখন্ডে চৈতন্যের অবতারত্বের কারণ ও প্রমাণ বণনায় লোচন মুরারিগুপ্তকে অনুসরণ করেন নি। মুরাবিগুপ্তে আছে নারদমুণি পৃথিবীতে

বৈষ্ণব খুঁজে না পেয়ে বৈকুণ্ঠে হরির কাছে চৈতন্য-অবতারের প্রস্তাব দেন। মুরারিগুপ্তে এটি একটি তথ্য মাত্র। লোচন অবতারত্বের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কৃষ্ণ-রুক্মিনী. শির-পার্বতী, নারদ-ব্রহ্মা সংবাদ লিখে প্রায় একটি দেবখন্ড রচনা করেছেন। মুরারিগুপ্ত. চৈতন্যকে যুগাবতার বলেছেন, লোচন বলেছেন পূর্ণ-অবতার। মুরারিগুপ্ত যে-সর সংস্কৃত গ্রন্থকে প্রমাণ হিশেবে ব্যরহার করেছেন, লোচন তার বাইরেও ভবিষ্যপুরাণ, জৈমিনি ভারত ও ব্রহ্মপুরাণের প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। এই সমস্ত পুরাণ মুরারিগুপ্ত ও লোচনদাসের মধ্যবর্তী কালে তৈরি হয়েছে রা যদি মুরারিগুপ্তের রচনার আগেই এই সর পুরাণ রচিত হয়ে থাকে তা হলেও মুরারিগুপ্তের সময় এহ সব পুরাণ পুরাণের মর্যাদা পায় নি।

লোচনেব বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই নতুন প্রমাণ সংগ্রহে নয়। তার একটি বৈশিষ্ট্য একটি দীর্ঘ দেবখন্ড বচনা। তাঁর অপর বৈশিষ্ট্য চৈতন্যের অনুগামী নরহরি সরকারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও নরহরি সরকারকে অনুসরণ করে গৌরনাগরী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা।

চৈতন্যের নবদ্বীপপর্ব নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কেউই নরহার সরকারের নাম করেন নি। লোচন সেখানে নবদ্বীপপর্বে চৈতন্যের সঙ্গে নরহরির সম্পর্কের কথা নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। গয়া থেকে ফেরার পর বিশ্বম্ভরের সঙ্গে নরহরি সরকারের দেখা হয একথা লোচন উল্লেখ করেছেন। কীর্তনের রর্ণনায় অনেকবার বলেছেন নরহারিকে পাশে নিয়ে চৈতন্য কীতন গাইছেন ও নাচছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁব শিষ্যরা যখন চৈতন্যকে খুঁজছেন লোচনে তখন সেখানেও নরহরিব প্রাধান্য। পরে চৈতন্যের রাঢ় ভ্রমণের সময়ও নরহরি তাঁব সঙ্গী। শান্তিপুর থেকে চৈতন্য যখন পুরী যাত্রা করলেন তখনো লোচনে নরহরি চৈতন্যের সঙ্গী। পুরীতে চৈতন্যের জগন্নাথ দর্শনের সময়ও নরহরি চৈতন্যের পাশে ছিলেন বলে লোচন উল্লেখ করেছেন।

চৈতন্য ও তাঁর অনুচর-সহচরদের জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের এত বেশি বিবরণ পাওয়া য়ায় যে সেই সব তথ্যের সাহায্য তাঁদের জীবনী পুনর্নির্মাণ সম্ভব। সেই তথ্য-অনুযায়ী নবহরি সবকার সম্পকে লোচনের এই তথ্যগুলি ভুল। কিন্তু এই ভুল ষোড়শ শতকের সাতের দশকে লোচনদাস হয়ত ইচ্ছে করেই করেছিলেন। তখনো গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে চৈতন্যের জীবন একটা দার্শনিক স্থিরতা পায় নি। এমনকী চৈতন্যতত্ত্বও তখন পর্যন্ত কোনো অদ্বিতীয় তত্ত্বে পরিণত হয় নি। অথচ চৈতন্য ও তাঁর অনুচর-সহচরদের কাহিনী শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় পররর্ত্তী সময়ের ভিতর প্রসারিত হয়েছে। চৈতন্য-আখ্যানের এই প্রসারণের সময় লোচন তাঁর মত করে একটি চৈতন্য আখ্যান তৈরি করে তুলছিলেন. যে - আখ্যানে তাঁর গুরু রা আদর্শ নরহরি সরকারের প্রাধান্য থাকবে। চৈতন্যজীবনের যে - আখ্যান প্রায এক শতক ধরে নির্মিত হচ্ছিল লোচনের এই কাহিনীও সেই আখ্যান নির্মাণের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। তখন লোচনের কাছে কোন তথ্য সত্য আর কোন তথ্য রানানো - এটা রিচার্য ছিল না। তাঁর রচনার তিনি কোন আখ্যান গড়ে তুলতে চান সেটাই ছিল প্রধান বিরেচ্য।

শুধু যে নরহরি সরকার সম্পর্কিত তথ্যই লোচন বানিয়েছিলেন তা নয়। নরহরি সরকার প্রবর্তিত গৌরনাগরীভাবের সঙ্গতি রেখে তিনি চৈতন্যের জীরনের বিভিন্ন ঘটনাও নতুন করে বানিয়েছিলেন। চৈতন্যের জন্ম মাত্র তার 'বিশাল নিতম্ব উরু কদলীর যেন' দেখে নদীয়া নাগরীদের 'অলসল অঙ্গ সভার শ্লথ নীবিবন্ধ'। গৌরাঙ্গের প্রথম বিয়ের সময় কয়েকটি অনুষ্ঠানের রর্ণনা

গৌরাঙ্গের নয়ন-সন্ধান-শরঘাতে।

মানিনীর মান-মৃগ পলায় রিপথে।।

অথির নাগরীগণ শিথিল বসন।
মাতল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন।।
রা
হেরইতে পঞ্চমুখ কী ভাব ডাঠল।
মরমে মদনজ্বরে ঢলিয়া পড়িল।।
কেহ কেহ বাহু ধার আথর হহয়া।
কেহ রহে উদ্বর্তন শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া।।
রা
বসন - বচন সব স্খলিত হইল।
নয়ন অলসযুত কাহারো হইল।।
কেহ কেহ পরশে অনঙ্গ রঙ্গ ভাবে।
ঢুলিয়া পড়ল রসে বিশ্বম্ভর কোলে।।

লোচনদাস গৌরনাগরীভাব অবলম্বন করে চৈতন্যের জীবনীতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। তাঁর গ্রন্থরচনার পরে চৈতন্যতত্ত্ব ও গৌড়ীয় বেষ্ণব তত্ত্ব একমাত্র তত্ত্বের মর্যাদা পায় ও চৈতন্যের জীবনের আখ্যান সেই তত্ত্বের আশ্রয়ে 'চৈতন্যচরিতামৃত'তে যেন পরিণত রূপ হিশেবে পুনর্নির্মিত হয়। জীব গোস্বামীর ত এতদূর পযন্ত আপত্তি ছিল যে সংস্কৃত ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় চৈতন্যবিষয়ক কোনো গ্রন্থ রাচত হলে চৈতন্যের মাহাত্ম্য ও এশ্বয ক্ষুন্ন হবে। পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণবশাস্ত্র চৈতন্যজীবনের আখ্যান নির্মাণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। যতাদন তা করে নি ততদিন লোচনদাসের মত কবি, এমনকী সন্ন্যাস নেয়ার জন্যে গৃহত্যাগের রাতে গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিজের হাতে সাজিয়ে কী ভাবে বিহার করেছিলেন তার বর্ণনা দিতে কোনো বাধা বোধ করেন নি।

অথচ লোচনও মুরারিগুপ্তের কড়চার ছাঁচের মধ্যেই চৈতন্যজীবনীকে সাজিয়েছেন। মুরারিগুপ্ত থেকে তিনি কোথায় কোথায় স্বতন্ত্র তারও একটি তালিকা বিমানবিহারী মজুমদারকে অনুসরণ করে তৈরি করা যায়। চৈতন্য যখন শচীদেবীর গর্ভে ছিলেন তখন অদ্বৈত আচার্য শচীদেবীর গর্ভবন্দনা করেছিলেন বলে লোচন লিখেছেন। মুরারি এ-রকম কোনো ঘটনার কথা লেখেন নি, তিনি শুধু লিখেছেন দেবগণ শচীর গর্ভবন্দনা করেছিলেন। লোচনে নিমাই ছোটবেলায় এক কুকুর পুষেছিলেন বলা হয়েছে, সে-কুকুর 'রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ বালয়া হাসে নাচে।' মুবারিতে এ ঘটনা নেই। মুরারিতে নিমাইয়ের বাল্যকালে কীর্তনের কথা নেই, লোচনে আছে। মুরারিতে শচীদেবীর সাতটি মেয়ে মারা য়াওয়ার পর বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর পবপর এই দুই ছেলে। কৃষ্ণের সঙ্গে চৈতন্যকে এক করে দেওয়ার জন্যে চৈতন্যকে লোচন অষ্টম গর্ভের সন্তান বলে রর্ণনা করেছেন। লোচনে শিশু নিমাই শচীর ষষ্ঠীপূজার নেবেদ্য খেয়ে নিয়ে বলেন, 'আমি তিন লোক সার'। মুরারিতে এ-ঘটনা নেই। লোচনে মুরারিকে নিয়েই একটা অদ্ভুত কাহিনী আছে। ছোটবেলায় নিমাই বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিলেন। মুরারি রাস্তা দিয়ে যেতে য়েতে মুখ ভ্যাংচালেন। প্রতিশোধ নিতে নিমাই দুপুর বেলায় মুরারিগুপ্ত যখন খেতে বসেছেন তখন সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুরারিগুপ্তের থালার ওপর প্রস্রার করে দিয়ে উপদেশ দিলেন, 'জ্ঞান কর্ম উপেক্ষিয়া কৃষ্ণ ভজ মন দিয়া'। লোচনে পৈতের সময় মাথা নেড়া করায় চৈতন্যের ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসের কথা মনে আসে। মুরারিতে এ-রকম কোনো ঘটনা নেই। লোচনে চৈতন্যের গয়া যাত্রার সময় শচীদেবী তাঁকে বলেন মাকে মনে করেও যেন

একটি পিন্ড চৈতন্য দেন। কারণ চৈতন্য পরে সন্ন্যাস নেবেন ও তার ফলে মায়ের উদ্দেশে কোনো পিন্ড দিতে পারবেন না। মুরারিতে এ-ঘটনা নেই।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর আখ্যানও বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব থেকে আলাদা ও তার রচনায় চৈতন্যের জীবনের প্রচলিত কাহিনী মেনে চলা হয় নি। জয়ানন্দ বৃন্দাবন কীভাবে তৈরি হয়েছে তার একটি কাহিনী যুক্ত করেছেন। জালিন্দ্র নামে এক অসুরের বৃন্দা নামে এক সতীসাধ্বী স্ত্রী ছিল। জালিন্দ্র ইন্দ্র হতে চেয়েছিলেন। বৃন্দার সতীত্বের গুণে ইন্দ্র কোনোভাবেই জালিন্দ্রকে পরাস্ত করতে পারছিলেন না। ইন্দ্রকে জয়ী করার উদ্দেশ্যে জনাদন জালিন্দ্রের রূপ ধরে বৃন্দার সঙ্গে বিহার করেন। পরে এ-কথা জানতে পেরে বৃন্দা জনার্দনকে অভিশাপ দেন। আর জনার্দনও ফাঁস করে দেন যে আসলে জনার্দন ও বৃন্দা হচ্ছেন লক্ষ্মী - নারায়ণের আর-এক প্রকাশ। পররর্তী বৈষ্ণবগণ জয়ানন্দের এই কাহিনীকে অশ্রদ্ধার সঙ্গে উপেক্ষা কবেছেন। জয়ানন্দ তাঁর কাব্য রচনা কবেছেন ১৫৬০ নাগাদ। চৈতন্যের মৃত্যুর পর মাত্র রিশ-পঁচিশ রছর তার মধ্যে কেটেছে। এই সময়ের ভিতবই জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে এমন অনেক কাহিনী লিখেছেন যার সমর্থন অন্য কোনো চৈতন্য আখ্যানে পাওয়া যায় না। জয়ানন্দ নয়টি খন্ডে চৈতন্য জীবনকে ভাগ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই নয়াট খন্ডে ইতিহাসের কালানুক্রমিকতা তিনি অনুসরণ করেন নি। চৈতন্যের জীবনের সুপরিচিত তথ্যকে চৈতন্যের জীবনী বর্ণনায় তিনি অন্যত্রস্থাপন করেছেন আবার প্রয়োজনে একই ঘটনা একাধিকরার বর্ণনা করেছেন। বস্তুত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কালানুক্রমিক রিররণের রিপরীত। জয়ানন্দ তাঁর নয়টি খন্ডেব প্রত্যেকটিকেই একটা সম্পূর্ণতা দিতে চেয়েছেন। তিনি নয়টি গানের পালা বেধেছিলেন। ও প্রত্যেকাট পালা রচনার সময় মূল ঘটনার আনুষঙ্গিক সব ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। ফলে তাঁব কাব্যকে যদি একটি কাব্য হিশেবে পড়তে হয় তা হলে পুনরাবৃত্তি একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে ধবা পড়বে। আর তার কাব্যকে যদি নয়টি স্বতন্ত্র পালা হিশেরে পড়া যায় তাহলে দেখা যাবে তিনি প্রত্যেকটি পার্শ্বকাহিনীকেও একটি সম্পূর্ণ বা সামগ্রিক পাঠে পরিণত করেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দারনে দীর্ঘদিন ধরে 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য রচনা করে ১৬১২ সাল নাগাদ সেটি শেষ কবেন। বৃন্দাবনেই এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ও এই গ্রন্থরচনার প্রধান উৎস ছিলেন চৈতন্যের শেষ জীরনের ষোল বছরের নিত্যসঙ্গী রঘুনাথ দাস গোস্বামী। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছ থেকে চৈতন্যের শেষ জীবনের তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন কৃষ্ণদাস। ফলে, 'চৈতন্যচরিতামৃত' শুরু থেকেই চৈতন্য আখ্যানের একাট প্রামাণিক পাঠ হিশেরে স্বীকৃত। সেই প্রামাণিকতা অর্জনের পথে হয়ত কিছু আপত্তি কোনো-কোনো মহল থেকে তোলা হয়েছিল, হয়ত জীব গোস্বামীর আপত্তির কথাও সত্য কিন্তু এই সব কোনো রাধাই শেষ পর্যন্ত টেকে নি। বৃন্দাবনে রাচত একটি বাংলা চৈতন্য আখ্যান কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক রচিত হয়ে ও গোস্বামীদের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বীকৃত হয়ে সারা বাংলাব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈতন্য সংক্রান্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থেব মর্যাদা পায়।

কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের স্পষ্ট দুটি ভাগ আছে কিন্তু এই ভাগ দুটি পরস্পর নিভরশীল। একভাগে আছে চৈতন্যের লীলা বা জীবনের ঘটনা। আর - এক ভাগে আছে চৈতন্যের তত্ত্ব, কৃষ্ণের তত্ত্ব, ভক্তি সাধনের ক্রম, সাধ্যবস্তু নির্ণয়, চৈতন্যের দ্বারা আস্বাদিত পদ ও শ্লোক। এই ঘটনা অংশ ও তত্ত্ব অংশকে চৈতন্য চরিতামৃতে পরস্পর থেকে পৃথক করা যায় না - এক-একটি তত্ত্বের আলোচনা এক-একটি ঘটনা থেকে এমন স্বাভাবিক ভাবে শুরু হয়েছে। আবার এক-একটি ঘটনা থেকে তত্ত্বের আলোচনা এমন স্বাধীনগতিতে এগিয়েছে যে সেই আলোচনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা

সবটুকু ঐ ঘটনানির্ভর নয়। আবাব, কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন একটি ঘটনার বর্ণনা করেন তখন সেই ঘটনাটিকে তার সম্ভাব্য সমস্ত ব্যাপকতায় বর্ণনা করেন। ঘটনা ও তত্ত্বের এই পরস্পর স্বতন্ত্র স্বাধীনতা ও বিকাশ আবার পরস্পর নিভরতা কৃষ্ণদাসেব রচনাকে চৈতন্য আখ্যানের মধ্যে বিশিষ্ট ও অতুলনীয় করে তুলেছে। আর সম্ভবত সেখানেই কৃষ্ণদাসের কাব্য রচনার ধরণের (form) সাফল্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত. তার কিছু কিছু মতান্তর সত্ত্বেও, যখন চৈতন্যবিষয়ক একমাত্র তত্ত্ব হিশেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তখন কৃষ্ণদাস এমন এক কাব্য লিখেছেন যেখানে তত্ত্ব আর কাব্যের সমপ্রাধান্য। আরার বাংলাদেশে চর্চিত চৈতন্যধর্ম চৈতন্যের মৃত্যুর একশ বছরের মধ্যেই বিভিন্ন স্বতন্ত্র আকার নেয়, তারা পরস্পর থেকে স্বতন্ত্রও হয়ে যায়। অদ্বৈতপন্থা, নিত্যানন্দ পন্থা, নরহরিসবকারের গৌরনাগরীতত্ত্ব এই রকম কয়েকটি তত্ত্ব। এই তত্ত্বগুলির সঙ্গে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের তত্ত্বের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ বৃন্দাবনের গৌড়ীয় বেষ্ণব তত্ত্ব তখন চৈতন্য বিষয়ক একমাত্র তত্ত্ব হিশেবে এমনই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে বাংলা দেশের সব রকমের বৈষ্ণবই সে-তত্ত্বকে স্বীকার করে নিতেন। এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য ছিল না। আবার সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও সতা যে এই গৌড়ীয় বেষ্ণব তত্ত্ব এই 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে পোছোছিল। ফলে, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ তত্ত্ব ও জীবনী যতই অনোন্যনির্ভর পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যে বিন্যস্ত থাকুক না কেন, বেষ্ণব পাঠকদের কাছে অর্থের দিক থেকে ঐ তত্ত্ব ও জীবনী একাকার হয়ে গিয়েছিল। চৈতন্যআখ্যানের এই অন্বয় অন্য কোনো চেতন্য জীবনী থেকে পাঠক তৈরি করে তুলতে পারেন না। সেই কারণেই 'চৈতন্যচরিতামৃত' পাঠকদের কাছে চৈতন্যআখ্যানের এক সম্পূর্ণ নতুন পাঠ হয়ে ওঠে। আর তারই ফলে 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচিত হওয়ার প্রায় একশ রছব আগে থেকে চেতন্য আখ্যানের যে সাহিত্যরূপ বিভিন্ন রচনায় আভাসিত হচ্ছিল, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ তা এক পরিণতি পায়। আমরা 'চৈতন্যচরিতামৃত'কেই চৈতন্য আখ্যানের প্রামাণিক সাহিত্য রূপ বলে ধরতে পারি।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর আর - একটি বৈশিষ্ট্য - এখানে চৈতন্যআখ্যানের ধরণটি এমন একটি আকার পেয়েছে যে ইতিপূর্বে চৈতন্য-অবলম্বিত সাহিত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ বলে পাঠক স্বীকার করে নিয়েছেন তার প্রায় সবটাই এখানে সমাবিষ্ট হতে পেরেছে। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তগুলি এখানে যথাক্রমে বিষয়-অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়েছে। তার ফলে যে কেবল সংস্কৃত অনভিজ্ঞ পাঠকরাই এই তত্ত্ব জানতে পারছেন তা নয়, যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় এই তত্ত্ব পাঠ করেছেন তাঁরাও বাংলা ভাষায় তার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণদাসের একটি প্রধান বিষয়ই সন্ন্যাসী চৈতন্যের অন্তরঙ্গ জীবন। সেই জীবনের বর্ণনায় হয়ত কখনো আমরা এ-রকম ইঙ্গিত পাই যে কৃষ্ণদাস পদাবলি সাহিত্যের ওপর নিভর করেছেন, কখনো-বা নিজেই পদাবলি রচনা করছেন। বেষ্ণব পাঠকদেব কাছে এই ঈশ্বর ভাবোন্মও চৈতন্যই ঈশ্বর, এই রাধাবিবহে কাতর চৈতন্য থেকেই বেষ্ণব পাঠকদের কাছে চৈতন্যবিরহ সঞ্চারিত হয়ে যায়। চৈতন্যের জীবনের শেষ আঠার বৎসরে নাটকীয় কোনো ঘটনা ঘটে নি। রাধাবিরহ - কৃষ্ণবিরহ বোধ ক্রমে-ক্রমেই তাঁর শরীর ও মনে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁব আখ্যান রচনার সবচেয়ে বড় দায় মেনে নিয়েছিলেন, চৈতন্যের জীবনের এহ শেষ পর্যায় বর্ণনায়। তার যোগ্য ভাষা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, নির্দ্বিধ চিত্তে তিনি অন্যান্য রচয়িতাদের রচনা থেকে গ্রহণ করেছেন, তাঁদেব রচনার প্রয়োজনীয় অংশ ব্যবহার করেছেন, কখনো বিবরণের মধ্য দিয়ে, কখনো লিবিকের মধ্য দিয়ে, কখনো সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি একক এক সন্ন্যাসীর আখ্যানকে আকার দিয়েছেন, যে সন্ন্যাসী সজ্ঞানে ও সুনিশ্চিত ভাবে নিজের দৈহিক অস্তিত্বকে অস্বীকাব করে এক পারমার্থিক অস্তিত্বের

দিকে একটু-একটু করে এগিয়ে যাচ্ছেন ও নিজের যৌবন-সমৃদ্ধ শরীরকে অবসানের দিকে নিজেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সন্ন্যাসী চৈতন্যের এই শেষ জীবনের যে-বর্ণনা কৃষ্ণদাস দিয়েছেন, তাই হয়ে উঠেছে রাঙালি বৈষ্ণবের আরাধ্য দেবতা। আধ্যাত্মিকতার এ-রকম সংক্রমণ ঘটাতে পেরেছিলেন বলেই চৈতন্যচরিতামৃত সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন, 'চৈতন্যচরিতামৃত মহৎ বই, মহৎ লেখকের লেখা, মহৎ শ্রোতার জন্য লেখা' (সুকুমার সেন)। চৈতন্যচরিতামৃত ধর্মগ্রন্থ হিশাবে লেখা হয় নি, কিন্তু পাঠক তাকে ধমগ্রন্থে পবিণত করেছে।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর এই পবিণতির আরো একটি কারণ কৃষ্ণদাসের গ্রহণ ক্ষমতা। কৃষ্ণদাস তাঁর পূববর্তী রচনাকারদের কাছ থেকে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করেছেন। সেই গ্রহণের পদ্ধতির মধ্যে সম্পাদনাও ছিল। আরার যখন চৈতন্যের জীবনের কোনো ঘটনার বর্ণনায় তাঁর পূর্ববর্তী রচনাকারদের রচনা বিশ্বস্ত বা যথায়থ রা যথেষ্ট মনে করেন নি, তখন তিনি নিজে সেই বিশেষ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণদাস এমন অনেক ঘটনা রর্ণনা করেছেন যা মুরারিগুপ্তের কড়চা, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'স্তবাবলী', রূপ গোস্বামীর 'স্তব মালা', কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক বা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্যেও নাই। ফলে তাঁর এই আখ্যান একই সঙ্গে হয়ে দাঁড়িয়েছে, মৌলিক রচনা আর পূববর্তাদের রচনার সংগ্রহ. পারবতন ও পরিবর্জন। ফলে 'চৈতন্যচরিতামৃত' তার আগে রচিত সমগ্র চৈতন্যসাহিত্যের একটি সার-সংকলন হয়ে উঠেছে ও তার ভিতর দিয়ে চৈতন্যের একটি প্রামাণিক জীবনী নির্মিত হয়েছে।

ছয়

আমরা এতক্ষণ এইটিই বুঝবার চেষ্টা করে আসছি চৈতন্যজীবনী বলে চিহ্নিত যে - চৈতন্য আখ্যান পরবর্তীকালে সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃতি পেয়েছে তা একটা কোনো রচনার রা এক ধরণের কোনো রচনার কোনো নতুন বৈশিষ্ট্যের ফলে ঘটে নি, তেমন ঘটতেও পারে না। সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বিশেষ সাহিত্যরূপ একজন কোনো লেখক রা কবির রচনার মধ্য দিয়ে নাটকীয় ভারে জন্মায় না। দশকের পর দশক ধরে নানা ধরণের রচনার মধ্য দিয়ে সেই নতুন রিষয়ের অনুভব ধীরে-ধীরে স্থির আকার পায়, তারপর এমনকি এক শতাব্দ দুই শতাব্দ পরে আমরা পশ্চাদদৃষ্টিতে দেখতে পাই সেই নতুন সাহিত্যরূপ আকার নিয়ে ফেলেছে। নতুন সাহিত্যরূপ সম্পর্কে আমাদের সেই নিশ্চিত জ্ঞান পরবর্তীদের পশ্চাদদৃষ্টিরহ ফল, তৎকালীন রচয়িতাদের ভবিষ্যৎদৃষ্টির ফল নয়।

ঘটনাটি এমনও নয় যে কোনো ঐতিহাসিক ক্রম অনুসরণ করে ধীরে-ধীরে চৈতন্য আখ্যানের এই বিশেষ সাহিত্যরূপটি তৈরি হয়েছে। বস্তুত এক্ষেত্রে সে রকম কোনো সাহিত্যক্রম আরোপ করাও যায় না। বৃন্দাবন গোস্বামীদের বিভিন্ন রচনা. চৈতন্যসমকালীনদের পদাবলি. গৌরবিষয়ক পদাবলি, মুরারিগুপ্তের কড়চা, কবি কর্ণপুরের সংস্কৃত মহাকাব্য 'চৈতন্যচরিতামৃত', কবি কর্ণপুরের সংস্কৃত নাটক 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'. বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' - এই রচনাগুলি চৈতন্যআখ্যান সাহিত্যের একটি কালানুক্রমিক ইতিহাসের আভাস দিচ্ছে এমন কোনো সিদ্ধান্তেও পৌঁছনো যায় না। কারণ. এই রচনাগুলির মধ্যে কোনো কালানুক্রমিকতা নেই। বৃন্দাবন গোস্বামীরা ষোড়শ-সপ্তদশ শতক জুড়েই তাঁদের রচনাগুলি লিখেছেন। আরার তাঁদের রচনার আগেই চৈতন্য সমসাময়িকদের চৈতন্যরিষয়ক পদাবলি লেখা হয়ে গেছে। গৌরবিষয়ক পদাবলি তৈরি হয়েছে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক জুড়ে ও সেই সময়ের মধ্যে তাদের আকৃতি - প্রকৃতির নানা রূপান্তরও ঘটেছে। মুরারিগুপ্তের

কড়চা আদি রচনা, সে-কড়চাকে কোনো সাহিত্যরূপে বাঁধা যায় না। কবি কর্ণপুরের সংস্কৃত রচনাগুলির সঙ্গে-সঙ্গেই বাংলায় বৃন্দাবন দাসের কাব্য লেখা হয়ে গেছে। লোচনদাস বা জয়ানন্দ রচনার বিষয় ও ধরণ বৃন্দাবন দাসের কাছ থেকে গ্রহণ করেন নি। আবার অন্যদিকে কৃষ্ণদাস, বৃন্দাবনদাসের কাছ থেকে বিষয় ও ধরণ অনেকখানি গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং বাইরের দিক থেকে দেখলে এগুলো বিচ্ছিন্ন চেষ্টা। তবু বিষয়ের দিক থেকে দেখলে এই সর চেষ্টারই মধ্যে একটি জায়গায় মিল আছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরাই হোন, কবি কর্ণপুরই হোন - তাঁরা সংস্কৃত নাটক, মহাকাব্য, টীকা ও ভাষ্য সাহিত্যের মধ্যে নতুন একটি বিষয়ের সঞ্চার করছিলেন, যাকে আমরা এখন চৈতন্যবিষয় বলে চিহ্নিত করতে পাবি। চেতন্য সমসাময়িক পদকতাবাই হোন আর চৈতন্য পরবর্তী পালাকীর্তন রচয়িতারাই হোন, তাঁরা বাংলা রাধাকৃষ্ণ সাহিত্যে একটি নতুন বিষয়ের সঞ্চার করছিলেন, যাকে আমরা চৈতন্য বিষয় বলে চিহ্নিত করতে পারি। বৃন্দাবন দাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস বাংলা আখ্যানকাব্যে একটি নতুন বিষয়ের সঞ্চার করছিলেন, যাকে আমরা চৈতন্যবিষয় রলে চিহ্নিত করতে পাবি।

তাঁরা যে-যে সাহিত্যরূপেব মধ্যে কাজ কবছিলেন, এই চৈতন্যবিষয়ের সংক্রমণে সেই সব সাহিত্যরূপের অনেক বদল ঘটে যাচ্ছিল কারণ এই সর সাহিত্যরূপ চৈতন্যবিষয়ের মত নতুন বিষয়কে ধারণ কবার মত নমনীয়তা ইতিপূর্বে অর্জন করে নি। ফলে এই সব সাহিত্যরূপের পূর্বনির্ধারিত অনড়তা চৈতন্যবিষয়কেও খানিকটা অনড় করে দিয়েছে। আবার অন্যদিকে চৈতন্যবিষয়ের নবীনতা এইসব আধারকেও অনেকখানি নমনীয় ও প্রসারক্ষম করে দিয়েছে। তাই এই সব রচনা অনেকখানি সংস্কৃত কাব্য আবাব অনেকখানি চৈতন্য আখ্যান, অনেকখানি সংস্কৃত নাটক আবার অনেকখানি চৈতন্য আখ্যান, অনেকখানি সংস্কৃত সন্দর্ভ আবার অনেকখানি চৈতন্য আখ্যান, অনেকখানি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলি আরাব অনেকখানি চৈতন্য আখ্যান, অনেকখানি বাধাকৃষ্ণ পালা আবার অনেকখানি চৈতন্য আখ্যান। এর মধ্যে বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাসেব রচনা সবচেয়ে স্পষ্ট ভাবে চৈতন্য আখ্যানকে আকার দিয়েছে কিন্তু এই কাব্যগুলিও অনেকখানি সেই সময়ে প্রচলিত বিজয়কাব্য ও মঙ্গলকাব্য, অনেকখানি চৈতন্য আখ্যান। কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আমরা প্রথম সেই সাহিত্যরূপের দেখা পাই যেখানে পুবতন সাহিত্যরূপের সঙ্গে সম্পর্ক সবচেয়ে কম ও চৈতন্য আখ্যান হিশেবে তার বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে প্রকট যদিও চৈতন্য আখ্যানের সেই প্রকট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পদাবলি সাহিত্যের চিহ্ন, সংস্কৃত সন্দভ ও টীকা সাহিত্যের চিহ্ন অনেক স্পষ্ট ভারে লক্ষ কবা যায়। তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচারিতামৃত'কেই আমরা সেই বিশেষ মুহূর্ত বলে চিহ্নিত করতে পারি যেখানে চৈতন্যজীবনের আখ্যান একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যরূপের জন্ম দিয়েছে। 'চৈতন্যচরিতামৃত' আমাদের সেই পবিণতিরিন্দু, যেখান থেকে পেছিয়ে গিয়ে আমরা ইতিহাসে চৈতন্যজীবনের আখ্যান গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারি।

এই চৈতন্য জীবনের আখ্যানের সাহিত্যরূপ গড়ে উঠতে একশ বছরের মত সময় লেগেছে, যে-কোনো নতুন সাহিত্যরূপ গড়ে উঠতে এ-রকমই এক একটা দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়. আর এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আখ্যানতুল্য অনেক সাহিত্যরূপ রা সাহিত্যের প্ররাহ রা এমনকী আখ্যায়িকা গড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা আমাদের হতে থাকে। চৈতন্য আখ্যানের এই নতুন সাহিত্যরূপ, যে-সব সাহিত্যরূপ প্রচলিত আছে তার কোনো-কোনো বৈশিষ্ট্য সমাবেশ করে তৈরি হয় না। এই নতুন সাহিত্যরূপের সংক্রমণের অভিঘাতে পুরনো সাহিত্যরূপগুলিও রদলাতে থাকে। ঘটনাটি এমন কখনোই নয় যে সরকিছুই আগে থাকতে ঠিক করা আছে, কোনো এক কবি এসে সেই সর কিছুকে

নতুন বিষয়ের সঙ্গতিতে সাজিয়ে দিলেন, যেন এমনকী নায়ককেও অনেকখানি প্রস্তুত করেই রাখা হয়েছে পুরনো কোনো আদর্শে. কবি এসে সেই নায়কের চরিত্রে ও কাজকর্মে নতুন কতকগুলি অর্থ জুড়ে দেন মাত্র। যে কবি রা লেখক তার রচনায় মধ্য দিয়ে নতুন সাহিত্যরূপকে খানিকটা আকার দেবেন তাঁকে সেই নতুন সাহিত্যরূপের মত করে তাঁর চারপাশকে চিনে নিতে হবে। সেই চিনে নেয়ার প্রক্রিয়াতেই ঐ সাহিত্যরূপের ভবিষ্যতের আকার অনেকখানি নির্ধারিত হয়ে যায়। চৈতন্য আখ্যানের সাহিত্যরূপ কোনো নির্দিষ্ট ফর্ম বা সাহিত্যের কোনো বিশিষ্ট একটি ধরণ মাত্র নয়। আবার উল্টোদিকে এই সাহিত্যরূপ কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব নয়। 'সাহিত্যের ধরণ নির্ণীত হয় এমন এক তত্ত্ব' ('form shaping ideology') বা তত্ত্ব স্পষ্ট আকার পায় সাহিত্যের এমনই এক ধরণ। একটা নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাকে রূপ দেয়ার জন্যে একটা নির্দিট সৃষ্টিক্রিয়া। কবি বা লেখককে সেই সাহিত্যরূপের নির্দিষ্ট দর্শন দিয়েই তার বিষয়কে দেখতে হবে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা আখ্যানের নির্দিষ্ট দৃষ্টি দিয়ে চৈতন্যকে দেখেন নি, দেখেছেন কখনো নাটকের, কখনো কাব্যের, কখনো সন্দর্ভের, কখনো টীকা ভাষ্যের নির্দিষ্ট দৃষ্টিতে। আবার লোচনদাস - জয়ানন্দও আখ্যানের নির্দিষ্ট দৃষ্টি দিয়ে চৈতন্যকে দেখেন নি, দেখেছেন কখনো মঙ্গলকাব্যের বিজয়কাব্যেব নির্দিষ্ট দৃষ্টি দিয়ে। গৌরচন্দ্রিকা পদাবলি বচয়িতারাও চৈতন্য আখ্যানকে সাজিয়ে নিতে চেয়েছেন রাধাকৃষ্ণ আখ্যানের ছকের মধ্যে অনড়ভাবে। এক বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্যে এই আখ্যানের দৃষ্টিতে চৈতন্যকে আবিষ্কার করেন অনেকখানি, কিন্তু শেষ পযন্ত তা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেন না, তার আখ্যানদর্শিতা শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যায়। আর কৃষ্ণদাস তাঁর কাব্যে এই আখ্যান-দৃষ্টিতে চৈতন্যকে সম্পূর্ণ আবিষ্কার করেন, চৈতন্য আখ্যানের সাহিত্যরূপের বাইরে তিনি কোথাও তাঁব চৈতন্যবিষয়কে উচ্ছিত হতে দেন না, বা এই একই কথা উল্টো করে বলা যায়, তাঁর চৈতন্য আখ্যানের সাহিত্যরূপ এতই সম্প্রসারণশীল যে চৈতন্যজীবনের সমগ্রতা পযন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে। সাহিত্যরূপের এই সম্প্রসারণশীলতাকে কোনো ছকে বাঁধা যায় না, কোনো নিয়মে বাঁধা য়ায় না, কোনো কালানুক্রমিকতায় বাঁধা যায় না। কারণ সাহিত্যের ধবণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দিয়ে বা বিমূর্ত দার্শনিকতা দিয়ে সাহিত্যরূপকে ব্যাখ্যা করা যায় না যদিও এ-সবই একটি সাহিত্যরূপের ভিতরে থেকে যেতে পারে। লেখকরা য়খন লেখেন তাঁরা অনেক সময় এমন মতই প্রকাশ করে ফেলতে পারেন যাব সঙ্গে এহ সাহিত্যরূপের তত্ত্ব মেলে না। কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে চৈতন্যআখ্যানের যে-নিহিতার্থ কখনো উচ্চকিত হয়ে ওঠে. কখনো - বা আখ্যানের ভিতরে ঢুকে যায়, তা কোনো শব্দার্থ. বা শ্লোকার্থ বা বাক্যার্থ থেকে তৈরি হয়ে ওঠে না। এই রচনার বিষয়গত সমগ্রতা ঐ শব্দার্থের রা শ্লোকার্থেব বা বাক্যার্থের বাইরে চলে যায়, বা, বাইরে থেকেই আসে। ঐ পাঠ্যবিষয়ের অর্থের সঙ্গে ঐ বিষয়গত সমগ্রতাকে বেঁধে বাখা যায় না। কারণ কোনো মহৎ সাহিত্যকর্মের কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থ থাকে না, সেই নির্দিষ্ট অর্থ আবিষ্কার করার কোনো পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াও নেই। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' যে চৈতন্য আখ্যান বর্ণিত হয়েছে তার অর্থ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ব মধ্যেই সীমারদ্ধ নয়। এমনকী কৃষ্ণদাস কবিবাজ যে উদ্দেশ্যে নিয়ে চরিতামৃত রচনা করেছেন সেই উদ্দেশ্যের মধ্যেও চরিতামৃতের অর্থ নিহিত নেই। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে চরিতামৃতের অর্থ বেড়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে, নতুন হয়েছে। কোনো একটি অর্থে যদি চরিতামৃত নির্দিষ্ট থাকত তাহলে সময়ের সঙ্গে অর্থের এই বদল ঘটতে পারত না। কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' চৈতন্যআখ্যানের পরিণতিবিন্দু - এটা ধরে নিয়ে আমরা এর পব বোঝার চেষ্টা করব কী ভাবে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর পাঠ্যবস্তু নির্মিত হয়েছে, কী ভাবে তার ভিতর

নতুন অর্থ সঞ্চারিত হয়েছে, ইতিপূর্বে রচিত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে'র সঙ্গে মিলিত ভাবে 'চৈতন্যচরিতামৃত' কোন পাঠ্যবস্তু নির্মাণ করে আর কোথায়ই-বা তা থেকে আলাদা হয়ে যায়।

দুই

পাঠ্যবস্তুর অখন্ডতা ও উপন্যাসের বীজ

এক

চৈতন্য আখ্যান যে - প্রায় একশ বছর ধরে তৈরি হয়ে উঠেছে তার আগে থেকেই মঙ্গলকাব্যের আখ্যান বাংলায় প্রচলিত ছিল। চৈতন্যের আগে মঙ্গলকাব্য লিখেছেন এ-রকম কবির উল্লেখ পাওয়া গেলেও তাঁদের কাব্যের কোনো পাথ পাওয়া যায় নি। যে মঙ্গলকাব্যগুলির পুথি পাওয়া গেছে তার সবগুলিহ প্রায় এই চৈতন্য - আখ্যানের গড়ে ওঠার সমকালীন বা তার পরবর্তী। তৎসত্ত্বেও মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে আখ্যানের এক ধরণের প্রাচীনত্ব ছিল। চৈতন্যের জীবনের প্রভাব কোনো-কোনো মঙ্গলকাব্যে পড়েছে বটে, তাতে মঙ্গলকাব্যের আখ্যানের অবয়বের কোনো পরিবর্তন হয় নি। অন্য দিকে, চৈতন্যআখ্যান রচয়িতাদের সামনে আখ্যানের আদর্শ বা ছক বলতে এক মঙ্গলকাব্যই ছিল। কোনো-কোনো চৈতন্য আখ্যানের কোনো-কোনো প্রসঙ্গে এই মঙ্গলআখ্যানের আংশিক প্রভাব পড়েছে। সে-প্রভাব এমনকী বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবত'-এর চৈতন্যের বাল্যকথার দু-একটি প্রসঙ্গেও লক্ষ করা যায়। আদি খন্ডের চতুথ অধ্যায়ে চৈতন্যের অবতারত্ব যেমন কীর্তিত হয়েছে. তেমনি, তাকে মঙ্গল কাব্যের নায়কের ছাঁচেও অনেকখানি গড়ে তোলা হয়েছে।

পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী - ব্রাহ্মণ।
আনন্দ সাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ।।
ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম।।
যত আপ্তবর্গ আছে সর্বে পরিকরে।
অহনিশি সবে থাকি বালক আবরে।।
কেহ বিষ্ণুরক্ষা কেহ দেবীরক্ষা পড়ে।
মন্ত্র পাড় ঘর কেহ চারিদিগ বেড়ে।।
তাবৎ কান্দেন প্রভু কমল লোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ।।
(চৈতন্য ভাগবত, আদিখন্ড, চতুথ অধ্যায়)
বা
এই মত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গন ভ্রমণ।।
জিনিয়া কন্দপ কোটি সর্বাঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ।।

সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমলনয়ন যেন গোপালের বেশ।।
আজানুলম্বিত ভুজ অরুণ অধর।
সকল লক্ষণযুক্ত বক্ষ পরিসর।।
সহজে অরুণ-গৌর দেহ মনোহর।
বিশেষে অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর।।
বালক স্বভাবে প্রভু যদি চলি যায়।
রক্ত পড়ে হেন দেখি মায়ে ত্রাস পায়।।

চৈতন্য আখ্যান ধীরে-ধীরে চৈতন্যের বাল্যবর্ণনার নিজস্ব ভাষা ও বিবরণ আবিষ্কার করেছে কিন্তু শুরুতে মঙ্গলকাব্যের ছায়া থেকে শিশু ও বালক চৈতন্য সম্পূর্ণ নিষ্ক্রান্ত হতে পারেন নি।

আবার চৈতন্য আখ্যানের প্রথম দিকের রচনাও এত স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট যে মঙ্গলকাব্যের সমান্তরালে এই আখ্যান হয়ে উঠল স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেই স্বাধীনতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার কারণ নিহিত ছিল চৈতন্যবিষয়ের ভিতরেই। একজন মর্তভক্তের ওপর নির্ভরশীল দেব বা দেবীর কাহিনীর ছাঁচের ভিতর চৈতন্যের মত পূর্ণাবতারের অবস্থান ও সক্রিয়তা কোনো ভাবেই আঁটানো যায় না, পরন্তু দ্বাপর যুগের স্মৃতি যে পূর্ণাবতারের ইহজন্মের প্রধান প্রবর্তনা। মঙ্গল-আখ্যানের বিস্তার স্বর্গমর্ত ধরে কিন্তু স্বর্গে ও মর্তে তার পাত্রপাত্রী আলাদা, তাদের সক্রিয়তাও আলাদা, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও আলাদা। চৈতন্য আখ্যানে স্বর্গমর্ত ব্যেপে কোনো একটি চরিত্রই প্রধান। চৈতন্য আখ্যানের কোনো-কোনো কাব্যের কোথাও-কোথাও স্বর্গের দেবদেবীরা থাকলেও তাঁদের কোনো ভূমিকা নেই, তাঁরা চৈতন্যের ভগবত্তার প্রমাণ হিশেবেই মাত্র উপস্থিত থাকেন। সেখানে স্বর্গের দেব-দেবীরাও মর্তের চৈতন্য পারিষদদের মত ব্যবহার করেন। চৈতন্য আখ্যানের কোনো-কোনো কাব্যের নাম চৈতন্যমঙ্গল হওয়া সত্ত্বেও কাহিনীর গঠনে ও মুখ্যচরিত্রের কল্পনায় চৈতন্য আখ্যান ও মঙ্গলকাব্যের আখ্যান সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে। এ-পার্থক্য ঘোচাবার কোনো উপায় আখ্যানকারদের হাতে ছিল না বলেই মঙ্গলকাব্যের আখ্যানের ছাঁচ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও চৈতন্য আখ্যান সম্পূর্ণ আলাদা একটা ছাঁচ গড়ে তোলে। স্বয়ং ভগবানের পূর্ণাবতারত্বের কাহিনী ও দ্বাপর যুগের সঙ্গে তাঁর স্মৃতিময় সংযোগ কখনো স্বর্গের কোনো অধস্তন দেব বা দেবীর নিজের পূজা প্রবর্তন করার অবলম্বন এক অনুগৃহীত ব্যক্তির জীবন কাহিনীর ছাঁচে তৈরি হতে পারে না।

মঙ্গলকাব্যের আঞ্চলিকতাকে চৈতন্য আখ্যান সম্পূর্ণত ভেঙে দিয়েছে। মঙ্গলকাব্যের আখ্যান চৈতন্য আখ্যান থেকে প্রাচীনতর, আবার প্রধানত চৈতন্য আখ্যানের সমকালীন। 'চৈতন্যভাগবত'-এ প্রাক-চৈতন্য বাংলার সংস্কৃতি রোঝাতে বৃন্দাবন দাস বলেছেন,

ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহুধন।।
(চৈতন্য ভাগবত, আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়)

আবার

যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।

ইহা শুনিবারে সর্ব লোক আনন্দিত।।

এত প্রাচীনতা ও জনবিশ্বাস সত্ত্বেও মঙ্গল আখ্যানের কোনো দেবতা সারা বাংলাদেশে সমভাবে পূজিত হন নি। মঙ্গল আখ্যানের দেবদেবী আঞ্চলিক দেবদেবী। এক-এক অঞ্চলে এক-এক দেবতার প্রাধান্য। তার মধ্যে মনসার মত দেবতার পূজার ব্যাপকতা হয়ত ধর্মঠাকুরের পূজার চাইতে বেশি। কিন্তু আঞ্চলিকতা এই দেবদেবীদের এতটাই প্রভাবিত করেছে যে তাঁদের নিয়ে লেখা কাব্যও এই আঞ্চলিকতার জন্যেই পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গে ও আসামে যে দেবদেবীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে খুব বেশি পরিচিত হতে পারেন নি। আবার রাঢ় অঞ্চলে বা বিহারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে - দেবতা নিজের প্রাধান্য বিস্তার করেছেন তিনি পূর্ববঙ্গ - আসাম - উত্তরবঙ্গ দূরে থাক, দক্ষিণবঙ্গেও নামতে পারেন নি।

চৈতন্য সেখানে এক সর্বভারতীয় পুরুষ। বাংলার নবদ্বীপ ও ওড়িশার পুরীতে তিনি জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন। এই দুই জায়গাতেই এক জনমন্ডলী তাঁকে ঘিরে রেখেছে। সেই জনমন্ডলী প্রধানত তাঁর ভক্তমন্ডলী। সন্ন্যাসগ্রহণের আগে ও পরে তিনি নবদ্বীপ থেকে পূর্ববাংলায় ও বিহারে গেছেন, উত্তরপ্রদেশে গেছেন, দাক্ষিণাত্যে গেছেন। বৃন্দাবনে তাঁকে আদর্শ করে একটা ধর্মমত তৈরি করে তোলা হয় ও বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সারা ভারতে চৈতন্যপ্রবর্তিত ধম প্রচার করেন। ভারতবর্ষে ধর্মচর্চার অনেক কেন্দ্রে তিনি গিয়েছেন ও সেখানে নিজের আচরণের মধ্য দিয়ে নিজের ধর্মাদর্শ প্রমাণ করেছেন। চৈতন্যের এই ভারতীয়ত্বের কাছে মঙ্গল আখ্যানের দেবদেবীর আঞ্চলিকতা ভেঙে গিয়েছে।

চৈতন্যের প্রত্যক্ষ অনুগামী এসেছেন সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। চৈতন্যের এই অনুগামীদের পরিচয় দিতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস বলেছেন,

গঙ্গাতীরে পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন অশোচ্য দেশেতে।।
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেন জন্মায়েন দূরে।।
যে যে দেশে গঙ্গা হরিনাম-বিবর্জিত।
যে দেশে পাষ্ডর নাহি গেলা কদাচিত।।
যে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সর জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া।।
(চৈতন্য ভাগবত, আদিখন্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়)

শুধু চৈতন্যের সর্বভারতীয়তাই নয়, তার প্রত্যক্ষ অনুগামীরা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন, তাতেই মঙ্গল-আখ্যানের আঞ্চলিকতা ভেঙে গেছে। এই অনুগামীরা নিজেরাই নিজেদের দীক্ষিত ভক্ত মনে করতেন. তাঁরা দু-একজন রাদে কেউই সন্ন্যাস নেন নি, প্রত্যেকেই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করেছেন। ফলে তাঁরা এক-এক জায়গায় চৈতন্যের প্রতি ভক্তি নিয়ে এক-একটি কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সেই সব কেন্দ্রে চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মের একটা ধরণই যে সরাই চর্চা করতেন তা নয়। কিন্তু এই সব ভক্তদের প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ও পরবর্তীদের কাছে চৈতন্য আখ্যানের

সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে ভক্তিধর্মের একটা ধরণ বৈষ্ণব সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় ও বৈষ্ণবলক্ষণ অনুযায়ী নিজেদের জীবনাচরণের চেষ্টার মধ্যে সেই ধর্মের কতকগুলি আচারও তৈরি হয়ে ওঠে। এই সব বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি শ্রীপাট হিশেবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক বিশেষ স্থানমাহাত্ম্য অর্জন করে। এই শ্রীপাট সারা রাংলাদেশে ছড়ানো। এই সমস্ত শ্রীপাটের স্বীকৃতি মঙ্গল আখ্যানের দেবদেবীদের স্থানিকতা সত্ত্বেও প্রাধান্য পায়। চৈতন্যের প্রত্যক্ষ অনুগামীদের পরে এই শ্রীপাট গুলিতে পররর্তী বৈষ্ণব ভক্তগণ বেষ্ণব ধর্মচর্চাকে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেন। ফলে যে একশ বছর ধরে চৈতন্য আখ্যানের বিশেষ সাহিত্যরূপটি গড়ে উঠেছে, সেই একশ বছর ধরেই বাংলায় চর্চিত বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন রূপ আকার পেয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের এই বিভিন্ন রূপের যে কোনো প্রকাশ্য বিরোধ কখনো দেখা দিয়েছিল তা নয়। ররং চৈতন্যকে আশ্রয় করে যে স্থান-নিরপেক্ষ বেষ্ণব ধম ছড়িয়ে পড়েছিল তার সঙ্গে এই সব আঞ্চলিক ও স্থানীয় দেবদেবীর সহাবস্থানই ছিল, কারণ, দুই ধরণের বিশ্বাস থেকে এই দুই ধরণের ধর্মচর্চা তৈরি হয়েছিল। অথচ সাহিত্যের বিচারে চৈতন্য আখ্যানের সর্বজনীনতা মঙ্গল আখ্যানের আঞ্চলিকতাকে অবান্তর করে দিতে পেরেছিল। আর চৈতন্য-প্রধান বৈষ্ণবধর্মের আধার ছাড়া এই চৈতন্য আখ্যানের অন্য কোনো আধার ছিল না।

চৈতন্যর ভগবত্তা ও ভক্তিধর্মই চৈতন্য আখ্যানের প্রধান বিষয়। কী করে চৈতন্য মায়াবাদী, অদ্বৈতবাদী, নৈয়ায়িক ইত্যাদি বিভিন্ন মতাবলম্বীদের পরাজিত করলেন তার বিস্তাবিত বিবরণ চৈতন্য আখ্যানে আছে। তৎসত্ত্বেও চৈতন্যের প্রবর্তিত ধর্ম অন্য কোনো পদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধিতার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা পায় নি। ররং বৈষ্ণবধর্ম - আচরণে সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করার ধর্মায় মনোভাবই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই চৈতন্য আখ্যানের সর্বভারতীয়তা ও সবজনীনতা মঙ্গল আখ্যানের আঞ্চলিকতার মহত্তর শিল্পগত বিকল্প হিশেরে প্রতিষ্ঠা পেলেও সামাজিক ধর্ম হিশেবে চৈতন্যভক্তি ও মনসা-চন্ডী-ধর্মে বিশ্বাস এক সঙ্গেই একটি জনসমাজের ভিতর সক্রিয় থাকতে পেরেছে।

মঙ্গল আখ্যানের ভিতর কাহিনীর সুনির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা দুটো ধরণই কাজ করেছে। নরখন্ডে আখ্যানকারকে অতিনির্দিষ্ট একটি আখ্যানকে অনুসরণ কবতে হয়েছে। অনুমান হয়. লিখিত পুথির আগেই গানের ভিতর দিয়ে নবখন্ডের এই আখ্যান স্থির ও প্রায় অপরিবতনীয় চেহাবা পেয়েছিল। মনসা, বা চন্ডা. বা ধর্ম তাঁদের পূজা প্রচারের জন্যে যাঁদের রেছে নিয়েছেন তাঁদের জীবন পূব-নিধারিত। সেখানে আখ্যানকার কোনো নতুন বিষয় সন্নিবেশ করতে পারেন না, মঙ্গল-আখ্যানের মধ্যে সে রকম কোনো সুযোগ নেই। সেই পূবনির্দিষ্ট জীবনের কাহিনীর মধ্যে কোনো-কোনো আখ্যানকার আখ্যানের কোনো-কোনো অংশের বর্ণনায় তাঁদের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই রকম কৃতিত্বের জন্যেই মুকুন্দরাম মঙ্গল-আখ্যানের শ্রেষ্ঠ কবি হিশেবে বিরেচিত হন।

আরার একই সঙ্গে মঙ্গলআখ্যানের দেবখন্ড অংশ অনেক বেশি অনির্দিষ্ট। সেখানে প্রত্যেক কবিই তাঁর নিজের মত করে স্বগের দেবদেবীদের কাহিনী রচনা করেছেন। এই দেবখন্ডের কাহিনীর কোনো নির্দিষ্ট আরম্ভ নেই বা নির্দিষ্ট সমাপ্তি নেই। দেবখন্ডের কাহিনী থেকে মঙ্গলদেব রা দেবী নরখন্ডে এসে যুক্ত হন। সেই সংযুক্তি কোনো শৃঙ্খলায় ঘটে না। এমনকি সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনাতেও প্রত্যেক কবি তাঁর নিজের মত করে সৃষ্টতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। উত্তরবঙ্গ - আসামে মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম কবি নারায়ণদেব-এর মনসামঙ্গল কাব্যের দেবখন্ড এতই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র যে সেই অংশটি 'কালিকাপুরাণ' নামে আলাদা কাব্য হিশেবে পবিচিত। আবার এই একই উত্তরবঙ্গ - আসামের কবি মনকর - দুর্গাবিরে শিবগঙ্গাদুর্গার কাহিনী ও মনসার জন্ম বিবরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। মঙ্গল-আখ্যানের কবিবা এই দেবখন্ডেই অনেক বেশি মৌলিক ও কল্পনানির্ভর। আখ্যানও তাই অনেক বেশি অনির্দিষ্ট।

চৈতন্য-আখ্যানে নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা মিশে গেছে, মঙ্গলআখ্যানের মত এ-রকম আলাদা নেই। আখ্যানকারদের কাছে চৈতন্য পূর্ণঅবতার। চৈতন্য জন্মের আগে থেকেই অবতার। তাঁর এই ভগবত্তার মধ্যে কোনো আনাদষ্টতা নেই, বরং এই ভগবত্তা অতিমাত্রায় নির্দিষ্ট। আখ্যানকাররা আখ্যানের ভিতর এই ভগবত্তাকে কী ভারে প্রামাণিক করে তুলবেন তার চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার মধ্যে এহটুকু ধাবাবাহিকতা মাত্র লক্ষ করা যায় যে চৈতন্যের জীবৎকাল থেকে যে আখ্যান কালগত ভাবে যত দূরে, তার ভগবত্তা তত বেশি পৌবাণিক ও অলঙ্কৃত। যে স্বরূপ - দামোদর চৈতন্যের চিরজীবনের সঙ্গী তাঁর কড়চাতেও চৈতন্যের ভগবত্তা স্বতোপ্রমাণিত, আর বৃন্দাবন দাস-এর 'চৈতন্য ভাগবত'-এ শিশু চৈতন্য হেঁটে গেলে তাঁর পদচিহ্নে বজ্র, পদ্ম ইত্যাদি আঁকা থাকে। যে-প্রায় একশ রছর ধরে চৈতন্য-আখ্যান তোর হয়েছে, সেই সময় জুড়ে চৈতন্যের জীবন অনেক বেশি প্রামাণিক হয়ে উঠেছে ও চৈতন্য - আখ্যানকারের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাড়ায় সেই প্রামাণিকতাকে রক্ষা করা। ফলে, চৈতন্যজীবনী নিয়ে আখ্যানকারেব কল্পনার কোনো সুযোগ ছিল না, যদিও নতুন - নতুন ঘটনার বর্ণনার ভিতর দিয়ে সেই জীবনকে প্রামাণিক করে তোলার অবকাশ তাঁর ছিল। বরং চৈতন্য-আখ্যান বচনার সময় যত বেড়েছে আখ্যানকারের সেই অবকাশও তত রেড়েছে। তাই 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ চৈতন্যজীবনী সরচেয়ে বেশি নির্দিষ্ট ও সবচেয়ে বেশি ঘটনাবহুল। মঙ্গল আখ্যানের 'দেবখন্ড'-এর অনির্দিষ্টতা চৈতন্যআখ্যানে হারিয়ে গিয়েছে আরার 'নরখন্ড'-এব নির্দিষ্টতা চৈতন্য আখ্যানে আরো রেশি নির্দিষ্ট হয়েছে।

মঙ্গল-আখ্যানের প্রধান আধার লোকায়তিক। লোকজীবনের দৈনন্দিন সংস্কার ও বিশ্বাসকেই মঙ্গলকাব্যে ধীরে ধীরে একটা পৌরাণিক চেহারা দেয়া হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলআখ্যান মূলত লোকায়তই থেকে যায়। মঙ্গল-আখ্যানের প্রত্যেকটি কাহিনীব পেছনেই আছে এই লৌকিক দেবতার পৌরাণিক দেবতায় রূপান্তরণের প্রয়াস। কিন্তু প্রায় তিন শতাব্দে ব্যাপ্ত এই মঙ্গল - আখ্যানের মধ্যে সেই রূপান্তরণ কখনোই সম্পূর্ণ হয় না ও মঙ্গল-আখ্যানের দেবদেবীরা হিন্দু দেবব্যবস্থায় কোনো সময়ই স্থান পান নি। এই সব দেবদেবীর পূজা এখনো প্রচলিত আছে। সে পূজা কোনো শাস্ত্রানুশাসনে সম্পূর্ণ হয় না, সম্পূর্ণ হয মেয়েদেব অন্তঃপুরের জীবন ও লোকজীবনে প্রচলিত আচার-আচরণ দিয়ে।

চৈতন্য আখ্যান এই লোকায়তকে অস্বীকার করে এক চৈতন্যপুরাণ নির্মাণ করেছে। চৈতন্য লোকজীবনের নায়ক, তার ধর্মও লোকধর্ম কিন্তু তাকে অবলম্বন কবে যে-আখ্যান শতবর্ষ ধরে গড়ে উঠেছে তা লোকায়ত জীবনকে আত্মসাৎ করে গড়ে ওঠে নি। চৈতন্য আখ্যানের প্রত্যেক রচনাতেই রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কবা হয়েছে. রচনার ইতিহাস রণনা করা হয়েছে. রচনার কারণ নির্দেশ করা হয়েছে, ও এই উদ্দেশ্য - ইতিহাস - কারণের মধ্যে বচনাকার নিজের স্থান নির্দেশ করেছেন। সেই স্থান নিরূপণে তিনি প্রধানত উল্লেখ করেছেন তিনি চৈতন্যের সঙ্গে ও চৈতন্যআখ্যানেব সঙ্গে কী ভাবে যুক্ত। সেই স্থান নিরূপণে তান প্রধানত উল্লেখ করেছেন তাঁর পূবগামী কবিদেব কথা. বৈষ্ণব মহাজনদের কথা ও সেই বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে তাঁব সঙ্গে কার কী সম্পর্ক সেই কথা। এই বিবরণের মধ্য দিয়েই তাঁর প্রধান উৎস কী তা জানানো হয়েছে। এইভাবে চৈতন্য আখ্যান একদিকে হয়ে উঠেছে নতুন বৈষ্ণব ধর্মেব অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ, অন্যদিকে সেই চৈতন্যআখ্যান বৈষ্ণব জীবনের পোর্বাপর্বের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে।

চৈতন্যের জীবনের তথ্যে, চৈতন্যের পরিকরদের জীবনের তথ্যে, বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনায় চৈতন্যআখ্যান এত নিশ্ছিদ্র যে সেখানে লোকায়তের প্রবেশের কোনো অবকাশ নেই। এমনও নয় যে চৈতন্যআখ্যান লোকায়ত জীবনে ও সাহিত্যে নতুন কোনো অংশ যোগ করতে পেরেছে। চৈতন্য

আখ্যানের অন্তর্গত পদাবলির রাগ নির্দিষ্ট, সুর নির্দিষ্ট, বিষয়ও নির্দিষ্ট। সেখানেও লোকসঙ্গীতের কোনো উপাদানের ব্যবহার সম্ভব ছিল না। চৈতন্য আখ্যান লোকায়তের বিপরীতে স্থাপিত।

মঙ্গল আখ্যানের সঙ্গে চৈতন্য আখ্যানের আখ্যানগত এই পার্থক্য এই দুই আখ্যানের উৎসের স্বাতন্ত্র্যের কারণেই ঘটতে পেরেছে। মঙ্গল দেবদেবীরা তাঁদের পৌরাণিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও আজও লোকায়ত থেকে গেছেন। আর চৈতন্য তাঁর লোকায়তিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও আজও পৌরাণিক থেকে গেছেন। কিন্তু সেই কারণেই আবার পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকেব মধ্যে বাংলায় আমরা একই সঙ্গে এই দুটি আখ্যান সাহিত্য পেয়েছিলাম।

দুই

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচিত হয়েছে আধুনিক কালে, ১৮৬৫তে 'দুর্গেশনন্দিনী'র সঙ্গে। আমরা দেখতে চাই প্রাচীন বাংলা আখ্যানে, এক্ষেত্রে চৈতন্যআখ্যানে, উপন্যাসের বীজ কতটা ছড়িয়ে ছিল। বাংলা সাহিত্যের বেলায় উপন্যাসের রূপ থেকে তার আদিবীজের সন্ধান সম্ভব নয়। কারণ বাংলা উপন্যাস বাংলা আখ্যান থেকে তৈরি হয় নি রা প্রাচীন বাংলা আখ্যান কোনো আধুনিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে পবিণত হয় নি। কিন্তু উপন্যাসের কতকগুলি শিল্পগত বৈশিষ্ট্য দেশকাল নিরপেক্ষতা অর্জন করেছে। আমাদের সন্ধানের বিষয় উপন্যাসের সেই দেশকালনিরপেক্ষ শিল্প বৈশিষ্ট্য চৈতন্যআখ্যানের মধ্যে কতখানি ছড়িয়ে ছিল।

চৈতন্য আখ্যান যেমন প্রায় একশ রছর ধরে বাংলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধরণ হিশেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তেমনি সেই বিশেষ স্বতন্ত্র ধবণ আবার একটি পবিণতির পর তার সেই স্বাতন্ত্র্য হাবিয়েও ফেলে বা তার সেই স্বাতন্ত্র্য আর নতুন ভারে বিকশিত হয়ে ওঠে না। সাহিত্যের এক-একটি ধরণ এইভারেই দীর্ঘ সময় জুড়ে তৈরি হয়ে একটি পরিণতিবিন্দুতে পৌঁছয় ও তাবপর সেটা ধীরে ধীরে রীতিসর্বস্ব হয়ে পড়ে। আমরা 'চৈতন্যচরিতামৃত' কে চৈতন্যআখ্যানের পবিণতিবিন্দু হিশেরে গ্রহণ করেছি। তারপর ধীরে-ধীরে বেষ্ণব আন্দোলন থেকে চৈতন্যেব প্রত্যক্ষতা, তাঁর পারিষদদেব সক্রিয়তা, তার পারিষদদের সাক্ষাৎ শিষ্যদের তৎপরতা অপসৃত হতে থাকে। বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনও নানা শাখায় ভাগ হয়ে যায়। চৈতন্যআখ্যানের অনুকরণে বৈষ্ণব মহান্তদের জীবনী, নিত্যানন্দ-অদ্বৈতদের জীবনী ইত্যাদি লেখা হয় ও চৈতন্যআখ্যান একাট সম্প্রদায়েব অনুসরণীয় ধর্মগ্রন্থে মাত্র পর্যবসিত হয়। এমনাক সে-ভাবেও চৈতন্য আখ্যান উনিশ শতক পযন্ত পৌঁছতে পারে নি। অপরদিকে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ মঙ্গল আখ্যানের কালগত রূপান্তর প্রায় উনিশ শতকের আরম্ভবিন্দু পযন্ত পৌঁছেছিল। ফলে, চৈতন্যআখ্যানের সঙ্গে বাংলা উপন্যাসেব কোনো কালগত সংযোগ স্থাপনেব কোনো সম্ভাবনাও ঐতিহাসিক ভারে ছিল না।

চৈতন্য আখ্যানের মধ্যে উপন্যাসের বীজ রা বৈশিষ্ট্য সন্ধানের সবচেয়ে বড় বাধা স্বয়ং চৈতন্য। চৈতন্যের জীবন ছাড়া চৈতন্য আখ্যান নেই। আর এই প্রধানতম চরিত্রের কোনো বিকাশ চৈতনা আখ্যানের কোনো রচনায় কোনো সময় দেখানো হয় না। দেখানো সম্ভবও নয় কারণ তা চৈতন্য সম্পর্কিত ঈশ্বর ধারণার বিরোধী। ঈশ্বব একটি বিশ্বাস বা সত্তা, তাব কোনো আরম্ভ, বিকাশ বা বিনাশ নেই। তাই চৈতন্য জন্মলাভের আগেও ঈশ্বর, চেতন্য তাঁর জীবনাবসানের পরও ঈশ্বর। তাঁর জীবনের কোনো স্তরে তাঁর এই ঈশ্বরত্ব নিয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ বা সংশয় দেখা দিতে পারে না। এই রকম একমাত্রিক চরিত্র কোনো উপন্যাসের চরিত্র হতে পারে না।

অথচ চৈতন্য আখ্যানে চৈতন্যেব এক ধবণের বিকাশ ত আবার দেখাতেও হয়। তাঁর জন্ম, শৈশর, কৈশোর, যৌবন, বিবাহ, বঙ্গদেশে গমন, দ্বিতীয়বার বিবাহ, পিতৃবিয়োগ, পিতৃপিন্ড দিতে

গয়াগমন, সেখান থেকে ভাববিহ্বল অবস্থায় প্রত্যাবর্তন, তাঁর ভাবাবেশ, অধ্যাপনাত্যাগ, কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে মিলে সঙ্কীর্তন, কৃষ্ণবন্দনার পথে কিছু বাধা দূর করা, তারপর খানিকটা আকস্মিকভাবেই সন্ন্যাসের সঙ্কল্প, সন্ন্যাসগ্রহণ, সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁর ভাবাবিষ্ট অবস্থা, নীলাচল গমন, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, বৃন্দাবন ভ্রমণ, নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গদেশ ভ্রমণ, নীলাচলে তাঁর আরো আবিষ্ট অবস্থা, শেষে তাঁর জীবনাবসান - এই ঘটনাগুলি ত চৈতন্যজীবনের ক্রমবিকাশের একটা রূপরেখা ছকে দেয়। চৈতন্য আখ্যানকাররাও এই ঘটনাগুলির বর্ণনা দেন ও এই রূপরেখার ছকটিকে স্বীকার করেন কিন্তু তাঁরা কোনো সময়ই তাকে ক্রমবিকাশ বলে গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ চৈতন্য ঈশ্বর, সবই তাঁর লীলা, তাঁর লীলার ভিতর দিয়ে তিনি পূর্ণ বিকশিত, লীলার ভিতর দিয়ে তিনি ক্রম বিকশিত নন।

কিন্তু আধুনিক পাঠক এই ঘটনাগুলির ভিতর দিয়ে চৈতন্যের ক্রমবিকাশও লক্ষ করতে পারেন। উপন্যাসের চরিত্র যে-বিভিন্ন আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে, চৈতন্যআখ্যানের চৈতন্যে সে-সকম কোনো আঘাত-সংঘাত নেই। বরং চৈতন্যেই সমস্ত আঘাত-সংঘাতের অবসান, সে-সংঘাত বাইরেরই হোক আর তাত্ত্বিকই হোক চৈতন্য সব আঘাত-সংঘাতের সমাধান। তৎসত্ত্বেও চৈতন্যের একটি বহির্জীবনকে আখ্যানকাররা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। উপন্যাসের আধুনিক পাঠক সেই বহির্জীবনের রূপরেখায় এমনকি চৈতন্যের মধ্যেও উপন্যাসের একটি চরিত্রের দূরাভাস পেতে পারেন। চৈতন্যের অন্তর্জীবনই চৈতন্যআখ্যানকারদের বিষয়। কিন্তু আধুনিক উপন্যাস পাঠকের বিষয় হয়ে উঠতে পারে সেই বহির্জীবন যে বহির্জীবনের আধার ছাড়া চৈতন্যের অন্তর্জীবন আকার পেতে পারে না। চৈতন্যের বহির্জীবনের সেই চিহ্নগুলির পাঠোদ্ধার আধুনিক উপন্যাস পাঠকের দায় হয়ে উঠতে পারে। সেই বহির্জীবনে একদিকে যেমন দেখা যাবে চৈতন্যআখ্যানে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতা, তেমনি আবার আর-একদিকে দেখা যাবে রাইবের অনেক ঘটনায় চৈতন্যের মানবিক প্রতিক্রিয়া, চৈতন্যের বিরক্তি বা রাগ, কখনো নগর সঙ্কীর্তনের নেতৃত্ব, কখনো একাকিত্ব সন্ধান। আর বহির্জীবনের এই চিহ্নগুলির মধ্যে চৈতন্যআখ্যানে বর্ণিত চৈতন্যজীবনের জটিলতার ইঙ্গিতও কিছু কিছু পাওয়া যাবে।

কারণ চৈতন্য সারা জীবন ধরে এক মানবনাট্য রচনা করেছেন। চৈতন্য আখ্যানে তাঁর এই মানবনাট্যের ওপর সব আখ্যানকারই জোর দিয়েছেন। তিনি যেখানেই গেছেন, যেখানেই থেকেছেন, সেখানেই তাঁকে ঘিরে এক ভক্তমন্ডলী আছে। সেই ভক্তমন্ডলী তাঁর সঙ্গে বিচিত্র সম্পর্কে বাঁধা। এমনকি দাক্ষিণাত্যে যখন তিনি একা একা ঘুরছেন তখনো তিনি নতুন ভক্তমন্ডলী সৃষ্টি করে চলেছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৃন্দাবন ভ্রমণের সময় তাঁর দুজন সঙ্গী অথচ যেখানেই যান সেখানেই অপরিচিত মানুষজনও দেখামাত্র তাঁর ভক্ত হয়ে যাচ্ছেন বলে ঘটনার পর ঘটনার বিবরণ বিভিন্ন আখ্যানে আছে। এই মানবনাট্যের কেন্দ্রে থাকায় চৈতন্যের ওপর তার প্রভাব পড়েছে আর এই মানবনাট্যকে চৈতন্য ত প্রভাবিত করেইছেন। চৈতন্যআখ্যানে চৈতন্যছাড়াও এই এক ভক্তসমাজ আছেন। চৈতন্য কোনো সময়ই এই ভক্তসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নন। আধুনিক উপন্যাস পাঠক এই ভক্ত সমাজের মধ্যে আবিষ্কার করতে পারেন চৈতন্যের প্রতি প্রত্যেকের একই ভক্তি সত্ত্বেও সেই ভক্ত সমাজের মধ্যেও এক স্তরপরম্পরা কাজ করেছে। সেই স্তরপরম্পরা তৈরি হয়েছে চৈতন্যের সঙ্গে এই ভক্তদের সম্পর্কের ভিত্তিতে। তাই নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর শাখা চৈতন্য আখ্যানে আলাদাভাবে বর্ণিত হয়, তাই পঞ্চতত্ত্বের প্রসঙ্গ আসে ও তাই চৈতন্যর পরিকরদের মধ্যেও শ্রেণীভাগের আভাস পাওয়া যায়।

সাহিত্যের আধুনিক ধরণগুলির মধ্যে উপন্যাসেই মানবনাট্যের এ-রকম সমাবেশ সম্ভব। সেই উপন্যাসের পাঠক চেতন্য আখ্যানের মানব নাট্যে উপন্যাসের সমধর্ম আবিষ্কার করতে পারেন।

চৈতন্য আখ্যানের এই ভক্ত সমাজ বা মানবসমাজ চেতন্য আখ্যানে বর্ণিত হয়েছেন অসংখ্য অনুপুঙ্খের সাহায্যে। কোনো আখ্যানকার যে চৈতন্যের প্রতি কম মনোযোগ দিয়ে তাঁর ভক্তমন্ডলীর অনুপুঙ্খ গড়ে তুলেছেন তা নয়। চৈতন্যের জীবনের সঙ্গে এই ভক্তদের সম্পর্কই বর্ণিত হয়েছে এমন অজস্র অনুপুঙ্খে। অনুপুঙ্খের এই ব্যবহার চেতন্য আখ্যানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসেই অনুপুঙ্খের সাহায্যে বিষয়কে এমন বর্ণনায় করে তোলা হয়। উপন্যাসের আধুনিক পাঠক চৈতন্য আখ্যানের এই অনুপুঙ্খের ব্যবহারের মধ্যে উপন্যাসের সমধর্ম আবিষ্কার করতে পারেন। বস্তুত এই অনুপুঙ্খের ব্যবহারে চৈতন্য আখ্যানকার বাস্তবকে বাধ্যত অনুসরণ করেছেন। কারণ, চৈতন্য আখ্যানের মানবচরিত্রগুলি মঙ্গল আখ্যানের চরিত্রগুলির মত কাল্পনিক নয়, বাস্তব। তাঁদের প্রত্যেকের আলাদা জীবনা আছে ও চৈতন্য আখ্যানকারকে এই অসংখ্য মানুষের সেই স্বতন্ত্র জীবনী নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়েছে। সেই জীবনী - অনুসরণে যদি কোনো ব্যত্যয় ঘটে তবে সেই আখ্যানের প্রামাণিকতাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চৈতন্যআখ্যানের বাস্তবতা নিশ্চয়ই ঔপন্যাসিক বাস্তবতা নয়। সে-বাস্তবতার ওপর সব সময়ই চৈতন্যভক্তির বিশেষ পরিস্থিতি আরোপিত। কিন্তু তবুও সেই চৈতন্যভক্তি বাস্তব চরিত্রের বাস্তর জীবনের ওপর নির্ভরশীল। রঘুনাথদাস গোস্বামী যে - জীবন থেকে চৈতন্যের কাছে আসেন, সনাতন গোস্বামী তেমন জীবন থেকে আসেন নি। সনাতনের জীবনের বৈশিষ্ট্য আবার স্বরূপ দামোদরের জীবনের অনুরূপ নয়। সপরিবার শ্রীবাসের জীবন আর নিত্যানন্দেব জীবন এক রকমের নয়। ভক্তদের জীবনের এই বৈচিত্র্য চৈতন্য আখ্যানকে এমনকী আধুনিক পাঠকের কাছেও উপন্যাসের তাৎপর্যে পূর্ণ করে তোলে। চৈতন্য আখ্যানের এই ভক্তবিবরণ চৈতন্য আখ্যানকে উপন্যাসের সবচেয়ে সন্নিহিত করে তোলে আর এই ভক্তগণই হচ্ছেন চৈতন্য আখ্যানের প্রধান নির্ভরস্থল। সেখান থেকেই অজস্র চরিত্র, অজস্র কাহিনী ও অজস্র ঘটনা চৈতন্য আখ্যানগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

এত ভক্তের বিচিত্র জীবন কথা ও তাঁদের সঙ্গে চৈতন্যের বিচিত্র সম্পকের ভিতর থেকে এক স্বরবৈচিত্র্য চৈতন্য আখ্যানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এই স্বরবৈচিত্র্য উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। একই সঙ্কীর্তনের আসরে অদ্বৈত যে - স্বরে ও ভাষায় চৈতন্যের বন্দনা করেন, নিত্যানন্দ সেভাবে করেন না। আবাব নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মধ্যে বিনিময় সব সময় এক ভাষায় হয় না। মুকুন্দগুপ্ত চৈতন্য আখ্যানে যে - স্বর সৃষ্টি করেন, শ্রীবাস বা তাঁর ভাইরা তা থেকে স্বতন্ত্র স্বর তৈরি করে তোলেন। ভক্ত যত বিচিত্র, তার স্বরও তত বিচিত্র, চৈতন্য আখ্যানের স্বরও ততোধিক বিচিত্র।

এই স্বরবৈচিত্র্য আর - একটি উৎস থেকেও তোর হয়েছে। বেষ্ণবরা পরম্পরায় বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাস থেকেই পরবর্তী কবি পূর্ববর্তী কবির কাব্যের সপ্রশংস সবিনয় উল্লেখ করেন। সেই পূর্ববর্তী কবির কাব্যকে পরবর্তী কবি যতটা সম্ভব ব্যবহারও করেন। ফলে, পরবর্তী কাব্যের ভিতবে সেই পূর্ববর্তী কবিদের কাব্যেব অনুপ্রবেশ ঘটে। আবার সেই পূর্ববর্তী কবি তাঁর গুরুস্থানীয় যে - চৈতন্য অনুগামীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তার স্বরও এই সূত্রে পরবর্তী কবিব কাব্যে ছড়িয়ে পড়ে কোথাও - কোথাও। ফলে পরবর্তী যুগের একটি কাব্য হয়ে দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী চৈতন্য অনুগামীর আভজ্ঞতা, পূববর্তী কবিব কাব্যরচনার আভজ্ঞতা, পরবর্তী কবির নিজেব সংগৃহীত তথ্য, পরবর্তী কবি যে-মহন্ত বা প্রধানকে তাঁর গুরুস্থানীয় ভেবেছেন তাঁর উপদেশাদি ও নির্দেশের সমাবেশ। ফলে একই আখ্যানেব একই বর্ণনায় কখনো কখনো চারটি স্বর শুনতে পাওয়া যায়। এই স্বরবৈচিত্র্য আধুনিক পাঠক একমাত্র উপন্যাসে পান। সেখানে চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্কের

জটিলতার সূত্রে উপন্যাসের ভিতর ক্রমাগত স্বরান্তর ঘটে যেতে থাকে। সেই স্বরান্তর উপন্যাসেব স্বরবৈচিত্র্য তৈরি করে তোলে। চৈতন্য আখ্যানকে যদি একটি অখন্ড পাঠ্যবিষয় হিশেবে গ্রহণ করা যায় তা হলে আমরা অনেক সময়ই একই ঘটনার একাধিক বর্ণনা পার। সেই একাধিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে একাধিক স্বর সেই অখন্ড আখ্যানের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। সেই স্বরবৈচিত্র্যের মধ্যে উপন্যাসের আদিরূপ আমরা পাঠ করতে পারি।

সমগ্র চৈতন্য আখ্যানে সংলাপের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের সংলাপ, চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর বিরোধীদের সংলাপ, কোনো-কোনো সময় একটি বিষয় নিয়ে চৈতন্যের সঙ্গে অন্য মতাবলম্বীর সংলাপ চৈতন্য-আখ্যানে ছড়িয়ে আছে। সংলাপই চৈতন্যের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু উপন্যাসে এই সংলাপ যেমন তৃতীয় ও স্বতন্ত্র একটি সত্যকে উদ্ঘাটিত করে চৈতনা আখ্যানের সংলাপ তেমন করে না। কারণ সেখানে চৈতনা সর সময়ই বিজয়ীর ভূমিকায় স্থির থেকে সংলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। উপন্যাসের সাংলাপিক কল্পনার সঙ্গে চৈতনা আখ্যানের সংলাপের এই গভীর পার্থক্য সত্ত্বেও ও চৈতন্য আখ্যানের সংলাপ প্রধানত একদেশদর্শী হওয়া সত্ত্বেও এই সাংলাপিক কল্পনা চৈতন্য আখ্যানেও খুব সরল ভাবে সক্রিয়। দিগ্বিজয়ী পরাভব, প্রকাশানন্দ বিজয়, কাজি দলন, সার্বভৌমের সঙ্গে বিচার, রায় রামানন্দের সঙ্গে বিচার - এই সমস্তই ঘটেছে সংলাপের ভিতর দিয়ে। সেই সংলাপের ধরণের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। যেভাবে দিগ্বিজয়ী পরাভব ঘটেছে. সেভারে রায় রামানন্দের সঙ্গে সংলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় না। আরার, রায় রামনন্দের সঙ্গে সংলাপে চৈতন্য তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধান্তের দিকে সমস্ত সংলাপকে পরিচালনা করা সত্ত্বেও, তিনি সেখানে একটা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিই ব্যরহার কবেন, 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর'। অর্থাৎ পূর্বসিদ্ধান্ত মেনে নিয়েও পররর্তী সিদ্ধান্তের দিকে সেই সংলাপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এইখানেই আমরা উপন্যাসের আধুনিক পাঠ অনুযায়ী সংলাপের একটা বিশেষ ধরণ দেখতে পাই।

চৈতন্য আখ্যানের ভিতরে রচনাকার নিজেকে প্রধান ভূমিকা থেকে সরিয়ে আনেন। আখ্যানের মধ্যে রারবার এই আখ্যান রচনায় তাঁর ভূমিকার অকিঞ্চিৎকরতার বিষয়ে তিনি বলতে থাকেন। তার একটি কারণ, চৈতন্য অনুগামিতার ইতিহাসে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানাঙ্ক ছাড়া ঐ আখ্যান রচনা কখনোই সম্ভর হত না। নিত্যানন্দের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া ও বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে নিত্যানন্দের বিশেষ সম্পর্ক ছাড়া 'চৈতন্য ভাগবত' রচনা সম্ভর হত না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যদি বৃন্দাবনবাসী না হতেন, বৃন্দাবনে চৈতন্যচর্চার বিশেষ পরিরেশের অন্তর্গত যদি তিনি না হতেন. বিশেষত রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সাহায্য যদি তিনি না পেতেন তা হলে 'চৈতন্যচরিতামৃত' লেখা হত না। নরহরি সরকাবের সঙ্গে লোচনের যদি গুরুশিষ্য সম্পর্ক না থাকত আর নরহরি সরকারের কাছ থেকে যদি লোচন চৈতন্যচবিতের গৌরনাগরী ব্যাখ্যা না জানতেন তা হলে লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করতে পারতেন না।

চৈতন্য আখ্যানের তাই কবি রা আখ্যানকারের বিশেষ ভূমিকা আছে। সেই বিশেষ ভূমিকা আছে রলেই তাঁরা কাব্যের মধ্যে সেই রিশেষ ভূমিকাকে এতরার অস্বীকার করতে চান। সেই অস্বীকৃতি সত্ত্বেও চৈতন্য আখ্যানের যে-কোনো কার্য প্রধানত তার কবির দ্বারা নির্যান্ত্রিত। চৈতন্য আখ্যানের আগে রা চৈতন্য আখ্যানের সমকালীন সাহিত্যের অন্য কোনো ধরণে কবির রা গ্রন্থকারের এই ভূমিকা দেখা যায় না। চৈতন্য আখ্যানেই সর্বপ্রথম গ্রন্থরচনার চেষ্টা হয় - তার আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থরচনার কোনো ধারণা ছিল না। চৈতন্যজীরনের বিভিন্ন ঘটনার ও তাঁর ধর্ম-অভিযানের রর্ণনায় কবি রা গ্রন্থকারের যে-ভূমিকা তার সঙ্গে আধুনিক উপন্যাসের ঘটনাপঞ্জির

ভিতর ঔপন্যাসিকের ভূমিকার তুলনা চলে। কবি বা গ্রন্থকারেব এই ভূমিকার মধ্যেও উপন্যাসের আদিরূপের সন্ধান অনিবার্য হয়ে ওঠে।

চৈতন্য আখ্যানেব একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তার নিরন্তর উৎসবময়তা। সেই উৎসব চৈতন্যের জন্মের আগে থেকে শুরু হয় ও চৈতন্যের জীবনাবসান পর্যন্ত চলে। সে-উৎসব এমন সর্বব্যাপক যে চৈতন্যের জীরনের কোনো নিভৃত মুহূর্ত চৈতন্য আখ্যানকার বর্ণনা করেন না। যে সর আখ্যানকাবের সে-রকম কবিত্বশক্তি আছে তাঁরা চৈতন্যের এই নিভৃতি বর্ণনার সময় চৈতন্য পদাবলি রচনা করেন। তখন চৈতন্য আর আখ্যানের বিষয় থাকেন না, লিরিকের বিষয় হয়ে ওঠেন। সেই বিশেষ উপলক্ষগুলি বাদ দিলে চৈতন্য আখ্যান এক বিরতিহীন উৎসরময়তার বিবরণ। চৈতন্যের বাল্যে ও যৌবনে নবদ্বীপের গঙ্গাপার ও পথঘাট এই উৎসবে মুখর, চৈতন্যের সন্ন্যাসোত্তর জীবনে তাঁর পর্যটনের পথগুলিতে উৎসর, চৈতন্য এমনকী যখন নীলাচলে প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় কৃষ্ণবিরহ যাপন করছেন তখনও তাঁকে ঘিরে এই এক উৎসব। তা-ছাড়া শ্রীবাস অঙ্গনে সঙ্কীর্তন, কাজিদলন উপলক্ষে নগব সঙ্কীর্তন, বঙ্গদেশ ভ্রমণ, কাশী-বৃন্দাবন ভ্রমণ, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ - এই সব বিশেষ উপলক্ষে চৈতন্যকে ঘিরে থাকা ভক্তমন্ডলী উৎসবে আত্মহারা হয়ে গিয়েছেন। চৈতন্য উৎসব এই সম্বিত হারানো চৈতন্যভক্তদের জীবনের আদর্শ। তাঁর আখ্যানকারও চৈতন্য ভক্ত হিশেরেই চৈতন্য আখ্যানের রচনাকাব। তিনিও সেই সম্বিতলোপী উৎসবে অংশ নিচ্ছেন। আধুনিক উপন্যাসে অসংখ্য মানুষের সমাবেশ থেকে এই উৎসব তৈরি হয়ে ওঠে। চৈতন্য আখ্যানের উৎসব মুখরতার মধ্যে উপন্যাসের আদি রূপে নিহিত এই উৎসবময়তার সঙ্কেত পাওয়া যায়।

চৈতন্য আখ্যান তার ক্রমবিকাশে বাংলা উপন্যাসের আখ্যানের সঙ্গে মিলতে পারে নি। এই দুই আখ্যানের মধ্যে সময়ের একটা বিরাট ফাঁক আছে - শতাব্দের চাইতেও বেশ ব্যাপ্ত। পবন্তু বাংলা উপন্যাসের আখ্যানের ছাঁচ প্রাচীন বাংলা আখ্যানে নিহিত নেই। বাংলা প্রাচীন আখ্যানের বিকাশের গতিও বাংলা উপন্যাসের আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত নয়। তবু উপন্যাসের শিল্পরূপের কতকগুলি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য চৈতন্য আখ্যানের মধ্যে আমরা সন্ধান করতে পারি। তার জন্যে প্রয়োজন চৈতন্য আখ্যানের এক বিশেষ পাঠোদ্ধার। চৈতন্য চরিত্রের বাইরের নানা ঘটনায়, চৈতন্যকে ঘিরে গড়ে ওঠা মানবনাট্যে, চৈতন্য আখ্যানের বিশিষ্ট স্বরবৈচিত্র্যে, কবি বা আখ্যানকারেব রিশিষ্ট ভূমিকায়, সাংলাপিক কল্পনায় ও নিরন্তর উৎসবময়তায় চৈতন্য আখ্যানের সেই ঔপন্যাসিক পাঠ নিহিত আছে।

তিন

কালানুক্রম অনুযায়ী মুরারিগুপ্তের কড়চা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' তত্ত্বগ্রন্থ, বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', লোচনের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' পরপর লেখা হয়েছে। কালানুক্রমিক হতিহাসের ধাবা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হযে থাকে যে এই রচনাগুলি ক্রমসম্প্রসারণও বটে। মুরারির কড়চায় যা শ্লোকাকারে বর্ণিত হয়েছে, কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য ও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে তার অনেক অংশ সম্প্রসারিত হয়েছে, আবার অনেক অংশে পরবর্তী কবি নিজের মৌলিকতা দেখিয়েছেন। মুবারি ও কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত রচনায় চৈতন্যজীবনের যে-ছাঁচটি তৈরি হযেছে, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' সেই ছাঁচটিই গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকী লোচনের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে' কবির মৌলিক কল্পনা অনেক বেশি সক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও মূল ছাঁচ হিশেবে মুরাবির কড়চাকেই লোচন গ্রহণ

করেছিলেন। কালানুক্রমিক এই বোধ থেকেই বলা হয়ে থাকে বৃন্দাবনদাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবত'-এ চৈতন্যজীবনের যে-অংশের বিবরণ দিয়েছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত'তে সেই অংশের বিবরণ দেন নি, বা, সে-বিবরণ সংক্ষেপে সেরেছেন, বা, সে-বিবরণের পরিপূরক অংশটুকুমাত্র নতুন করে লিখেছেন। কৃষ্ণদাস নিজেই তাঁর কাব্যে সে কথা বলেছেন।

কালানুক্রমের এই ধারণাটি অংশত ঠিক, ও অংশত ভুল। চৈতন্য আখ্যানকাররা কালানুক্রমিকতা স্বীকার করেছেন আবার কালানুক্রমিকতা অস্বীকার করেছেন। তাঁদের কাব্য তাঁদের পূর্ববর্তী কবিদের রচনার অনুসরণ আবার সেই কালানুক্রমকে অতিক্রম করে যাওয়াও বটে। চৈতন্য আখ্যানকার নিজের জীবনসীমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আবার সেই জীবনসীমাকে অতিক্রমও করে যেতে চান। আচরণীয় ধর্ম হিশেবে বৈষ্ণব ধর্ম পরম্পরায় বিশ্বাস করে। পরবর্তী বৈষ্ণবরা যে-কোনো পদ্ধতিতে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ অনুগামীদের মধ্যে কারো সঙ্গে নিজের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চান। চৈতন্যের সঙ্গে একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রতিষ্ঠা তাঁদের সকলেরই ইচ্ছা। এ ইচ্ছা তাঁদের ধর্মাচরণের অংশ। সেই কারণেই চৈতন্যআখ্যানে চৈতন্যরূপ বৃক্ষের নিত্যানন্দ শাখা, অদ্বৈত শাখা ইত্যাদি কল্পনা করা হয়েছে। পরম্পরার প্রতি এই ধর্মীয় আনুগত্য থেকেই পরবর্তী কবি পূর্ববর্তী কবিকে মহাজন হিশেরে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। সেই স্বীকৃতি না দিলে তাঁর বৈষ্ণবোচিত বিনয় ব্যাহত হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। তার ওপর চৈতন্যআখ্যানের আদি রচয়িতা দুজন হলেন মুরারিগুপ্ত ও স্বরূপ-দামোদর। মুরারিগুপ্ত নবদ্বীপে চৈতন্যের সঙ্গী ছিলেন। চৈতন্যের প্রাক-সন্ন্যাস জীবন থেকেই তিনি চৈতন্যের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী, অনেক ঘটনায় তাঁর সক্রিয় ভূমিকা আছে। সুতরাং পরবর্তী কবিরা মুরারিগুপ্তের কড়চাকে তাঁদের কাব্যরচনার প্রধান উৎস হিশেরে বর্ণনা করে চৈতন্যের জীবনকেই স্পর্শ করতে চেয়েছেন।

বৃন্দাবন দাসের মত কবি নিত্যানন্দের কাছ থেকে জানা বিবরণকেই নিজের কাব্যের বিষয় করেছেন। তাঁর বর্ণিত চৈতন্য আখ্যান নিত্যানন্দের সঙ্গে চৈতন্যের সম্পর্ক দিয়ে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। চৈতন্যজীবনের যে বৃহৎ ও স্বতন্ত্র অংশ নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে ছাপিয়ে গেছে সেই অংশের বিস্তৃত কোনো বিবরণ বৃন্দাবন দাস দেন নি। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'কে বলা যায় অনেকখানি চৈতন্যজীবনের নিত্যানন্দ-ব্যাখ্যান। বৃন্দাবন দাস নিজেই তাঁর কাব্যে সে কথা বলেছেন।

যাহার কৃপায় জানি চৈতন্যের তত্ত্ব।
যে প্রভুর দ্বারে ব্যক্ত চৈতন্য মহত্ত্ব॥
(চৈতন্য ভাগবত, আদিখন্ড, ৮ম অধ্যায়)

আবার

আদিদের জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যমহিমা স্ফুরে যাহার কৃপায়॥
চৈতন্যকৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দ জানিলে আপদ নাহি কতি॥

(ঐ)

আবার

হেন দিন হৈব কবে চৈতন্য নিত্যানন্দ।

দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিগে ভক্তবৃন্দ।।
সর্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তান হৈয়া যেন ভাজি প্রভু গৌরচন্দ্র।।
নিত্যানন্দস্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ এই অভিমত।।
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ।।

(ঐ)

কিন্তু বৃন্দাবনদাস, নিত্যানন্দের মত প্রধান অনুগামীর সঙ্গে এমন প্রত্যক্ষ যোগ সত্ত্বেও মুরারিগুপ্তের কড়চার ছাঁচকেই তাঁর কাব্যের ছাঁচ হিশেবে ব্যবহার করেছেন। বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুযায়ী নিত্যানন্দের সঙ্গে ও মুরারিগুপ্তের সঙ্গে যোগের ফলে 'চৈতন্য ভাগবত' বেশি প্রামাণিক হয়ে উঠেছে।

সে-রকমই লোচনদাস ছিলেন শ্রীখন্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য ও তিনি নরহরি সরকার প্রবর্তিত গৌরনাগরীতত্ত্বকে তাঁর কাব্যের প্রধান অবলম্বন করেছেন। সেই কারণে তাঁর কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় চৈতন্যজীবনের প্রধান আখ্যান থেকে স্বতন্ত্র. যদিও চৈতন্যজীবনের দার্শনিক - তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে লোচন দাস অনবহিত ছিলেন না। নরহরি সরকার চৈতন্যের প্রত্যক্ষ অনুগামী ছিলেন। আবার একই সঙ্গে লোচনদাস মুরারিগুপ্তের কড়চার ছাঁচও গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁর কাব্যের অংশবিশেষে মুরারিগুপ্তের প্রভাবও লক্ষ করা যায়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের জন্যে বিভিন্ন পূর্বসূত্র ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রধান সূত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁর কাছ থেকে তিনি চৈতন্যের জীবনের শেষ ষোল বৎসরের বিবরণ পেয়েছেন। তা ছাড়া 'মুরারিগুপ্ত, কবি কর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস ও স্বরূপ দামোদরের সংগৃহীত উপাদান ব্যবহারের সুযোগ কবিরাজ - গোস্বামীর ছিল' (শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত. ১ম খন্ড, ভূমিকা, রাধাগোবিন্দ নাথ, পৃ.৩৯)। কৃষ্ণদাস এঁদের উল্লিখিত ঘটনার বিবরণ ছাড়াও সেই একই ঘটনা অন্য সূত্র থেকে পরিপুষ্ট করেছিলেন ও আরো নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। কৃষ্ণদাস তাঁর বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে বৃন্দাবন চলে আসেন। বৃন্দাবনে তিনি রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্টের সঙ্গ নিয়মিত পেয়েছিলেন। এঁরা অনেকেই তাঁদের জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে চৈতন্যকে দেখেছিলেন, চৈতন্যের কাছ থেকে কোনো-কোনো বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন। এঁরা যখন বৃন্দাবনে বাস করতেন তখন আরো অনেক বৈষ্ণব সেখানে থাকতেন। বৃন্দাবনে বৈষ্ণবদের দিনচর্যার একটি অভ্যস্ত নিয়ম ছিল যে 'তাঁহারা প্রত্যহ নিয়মিতভাবে মহাপ্রভুর লীলার কথা চিন্তা করিতেন এবং আলাপ আলোচনা করিতেন' (শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, ১ম খন্ড, ভূমিকা, রাধাগোবিন্দ নাথ পৃ.৩৯)। চৈতন্যের জীবন সম্পর্কে সেই আলাপ - আলোচনায় এমনকী গোস্বামীরাও পরস্পরের অজ্ঞাত বিষয় পরস্পরের কাছ থেকে জেনে নিতেন। রঘুনাথদাস গোস্বামীর কাছ থেকে সনাতন ও রূপ চৈতন্যের নীলাচল পর্বের কথা শুনতেন।

মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর।।
(চৈতন্যচরিতামৃত, আদিখন্ড ১০ম পরিচ্ছেদ ১৮৯-১৯০ চরণ)

চৈতন্যের চরিত্র আলোচনা রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিত্যকর্মের অংশ ছিল।

রাত্রিদিবা রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন।।
(চৈতন্যচরিতামৃত, আদিখন্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ ১৯৫-১৯৬ চরণ)

ফলে বৃন্দাবনে চৈতন্যআখ্যানের একটা মৌখিক ঐতিহ্যও গড়ে উঠেছিল। অন্তত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থ রচনার সময় এই মৌখিক ঐতিহ্য থেকে যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছিলেন।

মুরারিগুপ্ত চৈতন্যের নবদ্বীপ পর্বের কথা ও স্বরূপ-দামোদর চৈতন্যের নীলাচল পর্বের কথা তাঁদের কড়চায় বলেছেন। এই দুই প্রধান পর্বের বাইরে অন্যান্য মুখ্য ঘটনার সময় চৈতন্যের কে কে সঙ্গী ছিলেন তার বিররণও পাওয়া যায়। চৈতন্যেব সমসাময়িক সঙ্গীর সংখ্যা, বিমানবিহারী মজুমদার নিরূপণ করেছেন. ৪৯০। এঁরা নানা পর্যায়ে চৈতন্যের প্রায় নিত্যসঙ্গী। এঁদের মুখ থেকে চৈতন্যের জীবনের ও বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়েছে ও অনুগামীদের পরিবার-পরিচিতজনদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। একমাত্র দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে চৈতন্য কোনো সঙ্গী নেন নি - কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ বালক ছাড়া। কিন্তু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের রড় সাক্ষী রায় রামানন্দ। দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার পথে একবার ও দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যারর্তনের পথে আরেকবার চৈতন্য গোদাবরী তীরে রিদ্যানগরে রায় রামানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। রায় রামানন্দের কাছে চৈতন্য নিজের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলেন। রায় রামানন্দের কাছ থেকে বৈষ্ণরমন্ডলীতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বৃত্তান্ত প্রচাবিত হয়েছে বলে রাধাগোবিন্দ নাথ অনুমান করেছেন। অর্থাৎ চৈতন্যজীরনের যে-পর্বের কোনো সাক্ষী ছিল না, সহযাত্রী ছিল না, অনুগামী ছিল না, সেই পর্বেরও এমন একজন রিবরণকার পাওয়া যায় যিনি প্রত্যক্ষত চৈতন্যেব সঙ্গে যুক্ত।

'চৈতন্যচরিতামৃত' কে আমরা চৈতন্য আখ্যানের পরিণতি বলে চিহ্নিত করেছি। এই রচনার অসামান্যতার ফলে চৈতন্যআখ্যান রংলা সাহিত্যেব একটি রিশিষ্ট ধরণ হিশেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যদিও সেই প্রতিষ্ঠার পেছনে চৈতন্যআখ্যান রচনাব প্রায় একশ বছরের ইতিহাস সক্রিয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর উৎস নির্দেশ করেছেন

আদিলীলা মধ্যে প্রভুব যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত।।
প্রভুর মধ্য শেষলীলা স্বরূপ-দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।।
এই দুজনার সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া।।
(চৈতন্য চরিতামৃত. আনন্দ সংস্করণ, আদিখন্ড ১৩ পরিচ্ছেদ, ২৭-৩২ চরণ)

দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্র লিখিয়াছে রিচারি।।
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দারন।।

চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ।।
গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে তেঁহো ছাড়িল যে-য়ে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে।।
প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্ত শেষ কিছু করিয়ে চবণ।।
(চৈতন্যচরিতামৃত আনন্দ সংস্করণ আদি খন্ড ১৩ পরিচ্ছেদ ৮৭-৯৬ চরণ)
যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি তার পার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয়ত বিস্তার।।
বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা রর্ণিল।
সেই সর লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল।।
তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল।।
অতএব সে-সর লীলা নারি রর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলা করি নমস্কারে।।
(চৈতন্যচরিতামৃত আনন্দ সংস্করণ, অন্ত্যখন্ড, ২০ পরিচ্ছেদ ১৫২-১৫৯ চরণ)
চৈতন্য লীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান।।
তাঁর রারি শেষামৃত যে কিছু আছিল।
অতকে ভারিল পেট তৃষ্ণা মোর গেল।।
(চৈতন্যচরিতামৃত আনন্দ সংস্করণ, অন্ত্যখন্ড, ২০ পরিচ্ছেদ ১৮৪-১৮৭ চবণ)
চৈতন্যলীলা রত্নসার স্বরূপের ভান্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথ কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা এই বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে।।
(চৈতন্যচরিতামৃত আনন্দ সংস্করণ, মধ্য খন্ড, ২য় পরিচ্ছেদ, ৪৬)
স্বরূপ গোঁসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ।।
সেকালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চাকর্তা রহে দূরদেশে।।
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুইজন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চাগ্রন্থন।।

স্বরূপ সূত্রকর্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার।।
(চৈতন্যচরিতামৃত, আনন্দ সংস্করণ, মধ্যখন্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ, ১১-১৮ চরণ)

জগাই মাধাই হতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।।
মোর নাম যেই শুনে তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তাব পাপ হয়।।
এমন নির্ঘৃণ মোবে কেরা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগত ভিতরে।।
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।
উত্তম অধম কিছু না কবে বিচার।।
যে আগে পড়য়ে তার করয়ে নিস্তার।
অতএর নিস্তাবিল মো হেন দুরাচার।।
মো হেন পাপিষ্ঠে আনিল শ্রীবৃন্দাবন।
মো হেন অধমে দিলা শ্রীরূপ চরণ।।
(চৈতন্যচরিতামৃত, আনন্দ, আাদখন্ড, পঞ্চম পবিচ্ছেদ, ৩৬৩-৩৭৪ চরণ)

বৃন্দাবনদাস কেল চেতন্য মঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সব অমঙ্গল।।
চৈতন্য নিতাইয়ের যাতে জানিয়ে মহিমা।
য়াতে জানি কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা।।
ভাগরতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছে ইহা আনি করিঞা উদ্ধার।।
(চৈতন্যচরিতামৃত, আনন্দ, আদিখন্ড ৮ম পবিচ্ছেদ ৬১-৬৬ চরণ)

চৈতন্যআখ্যান রচনার ভিতরই এই কালানুক্রমিকতা নিহিত আছে। পূববর্তা কবিকে উত্তমর্ণ হিশেবে স্বীকৃতি দেযা, চেতন্যের প্রত্যক্ষ অনুগামীদের স্মরণ করা, নিজের রচনাকে তুচ্ছ করা, নিজের বচনার সঙ্গে বৈষ্ণব ভক্তদের আদেশ-নিদেশকে যুক্ত করা, এ-সরই সেই চৈতন্যআখ্যান রচনার ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। সেদিক থেকে এই রচনাগুলির ভিতর কালানুক্রমিকতা আছে।

কিন্তু সে কালানুক্রমিকতা কখনোই এ-রকম নয় যে মুরারি গুপ্তের কড়চার অসম্পূর্ণতা কবি কর্ণপুর দূর করেছেন, রা কবি কর্ণপুরের রচনার অসম্পূর্ণতা বৃন্দাবনদাস দূর করেছেন, রা, বৃন্দাবনদাসের রচনার অসম্পূর্ণতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ দূর করেছেন। নতুন-নতুন রচনার মধ্য দিয়ে চৈতন্যআখ্যান কালানুক্রমে সংশোধিত হয় নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাররার বলেছেন, বৃন্দারন দাসের কাব্যে যে - কথা বলা হয় নি তিনি শুধু সেই কথাটুকু বলেছেন বা বৃন্দাবন দাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণকে তিনি বিস্তাবিত করেছেন মাত্র। এই বিনযবচন কৃষ্ণদাসের বৈষ্ণবজনোচিত ভঙ্গিমাত্র। এই কবিরা

তাঁদের নিজস্ব কারণে কাব্য রচনা করেছেন। সেই কারণে তাঁদের অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার ফলে ও তাঁদের তথ্যসংগ্রহের উৎসের সংকীর্ণতার ফলে - এক একজন কবি তাঁদের কাব্যকে এক-এক ধরণে বিস্তারিত করেছেন। কিন্তু তাঁরা সব সময়ই চৈতন্যের সমগ্র জীবনকে তাঁদের কাব্যের বিষয় হিশেবে গ্রহণ করেছেন। চৈতন্যের জীবনের কোনো খন্ডরূপ তাঁদের কাব্যের বিষয় নয়। বৃন্দাবনদাসে হয়ত চৈতন্যের জীবনের নরদ্বীপ পর্ব প্রাধান্য পেয়েছে ও নীলাচল পর্ব কম বিস্তারিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও বৃন্দাবনদাসও চৈতন্যের সমগ্র জীবনের আখ্যানকেই তাঁর কাব্যের বিষয় হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও বৃন্দাবনদাসের কাব্যে বাণত হয়েছে বলে চৈতন্যের নবদ্বীপ পর্বের কোনো প্রসঙ্গ বাদ দেন নি। সেখানেও নরদ্বীপ পর্বের এক ধরণের সম্পূর্ণতা আছে, সে-সম্পূর্ণতা বৃন্দাবনদাসের পবিপূরকতা থেকে অর্জিত হয় নি।

চৈতন্যআখ্যানের রচায়তারা চেতন্যের জীবনের সমগ্রতাকেই তাঁদের রচনার বিষয় হিশেবে গ্রহণ করেছেন। সেই সমগ্রতাতে জন্মের আগে থেকেই চৈতন্য, অবতার ও তাঁর শৈশর-বাল্য তাঁর জীবনান্তের মতই সমান গুরুত্বপূণ। সেই সমগ্রতায় চৈতন্যের জীবনের ধারাবাহিকতাও অপ্রাসঙ্গিক। চৈতন্যের জীবনের ধারারাহিকতা বা কালানুক্রম অনুসরণ করার কোনো দায় কবিদের ছিল না। সেখানে কালানুক্রম ভেঙে গিয়ে চৈতন্যের জীবনের সমগ্রতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। চৈতন্য আখ্যানগুলি যদিও আদিপর্ব, মধ্যপর্ব ও অন্ত্যপর্বে রিভক্ত ও এই বিভাগের মধ্যে যদিও একটি কালক্রম নিহিত আছে কিন্তু সে কালক্রম কাব্যে সর সময় মেনে চলা হয় না। রচনার প্রথমেই চৈতন্যের অবতারত্বের ও কাব্যরচনার য়ে কারণ বর্ণনা করা হয় তাতেই চৈতন্যের সমগ্র জীরন একবারে উপস্থাপিত হয় ও অন্ত্যপর্বের ঘটনা আদিপর্বের মধ্যে জায়গা করে নেয়। আরার অন্ত্যপর্বের শেষে যখন চেতন্যজীবনের সমগ্রতা পুনরুত্থাপিত হয় তখনো আদিপর্বের কাহিনী পুনর্বর্ণিত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ সম্বন্ধে রাধাগোবিন্দ নাথ যে মন্তব্য করেছেন, চৈতন্য আখ্যানের সব রচনা সম্পকেই সেই মন্তব্য সত্য। 'মহাপ্রভুর জন্ম ব্যতীত অন্য কোনও ঘটনার সময় সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী ঐতিহাসিকের ন্যায় কোনো উক্তিই কোথাও করেন নাই; বোধহয় অন্য কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থকাবও করেন নাই। কোন ঘটনার পরে কোন ঘঢ়না ঘটিয়াছে, সে-সম্বন্ধেও কবিবাজ গোস্বামীর বিবরণ হইতে কোনও পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। .... আসল কথা হইতেছে এই যে কবিরাজ - গোস্বামী শ্রী শ্রী গৌরসুন্দরের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন নাই; তজ্জন্য তিনি আদিষ্ট বা অনুরুদ্ধও হন নাই। তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন গৌরের লীলামাধুর্য বর্ণনা করিরার জন্য; তিনি তাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লীলামাধুর্য - বর্ণনই ছিল তাঁহার প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য। লীলামাধুর্য - বর্ণনের জন্য লীলার রা ঘটনার উল্লেখেরই প্রয়োজন, ঘটনার সময়ের কোনও প্রয়োজন হয় না। তাই কোনও লীলার মাধুর্য অভিব্যক্ত করার জন্য যে ঘটনা বা যে-যে ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক হইয়াছে, সেই ঘটনা বা সে-সে ঘটনার উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সময় সম্বন্ধীয় ক্রম রক্ষা করাব কথা বোধ হয় তাঁহার মনেও আসে নাই।' (রাধাগোবিন্দ নাথ, শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা, ৩৫ পৃ.)। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ সম্বন্ধে বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য সাধারণভাবে চৈতন্যআখ্যান সম্বন্ধে সত্য—।

'বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার ঐতিহাসিক মূল্য কিন্তু চারিটি কারণে কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। প্রথমত, তিনি নিত্যানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রী চৈতন্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ জীবনচরিত লেখক নিজের অজ্ঞাতসারে আলোচ্য জীবনীতে ব্যক্তিগত আদর্শের ছায়াপাত করেন। ....নিত্যানন্দের চরিত্রে উদ্দামতার একটি ধারা বিদ্যমান ছিল। নিত্যানন্দের ভক্ত বৃন্দাবনদাসের লেখায় শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে সেই উদ্দামতা কিছু সংক্রামিত হইয়াছে মনে হয়। .... গয়াগমনের পূর্বে

বিশ্বম্ভর মিশ্রের জীবনী বৃন্দাবনদাস কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ....'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে'র ঐতিহাসিক মূল্য ক্ষুণ্ণ হইবার তৃতীয় কারণ ক্রমভঙ্গ দোষ। কবি নিজেই বলিয়াছেন

এসব কথার নাহি জানি অনুক্রম।
যেতে মনে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম।। ২।১৯।৩০২
এসর কথার অনুক্রম নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের বল সে রাখানি।। ৩।৫।৪৪৪

এই রূপ ক্রমভঙ্গ হইবার কারণ এই যে কবি ঐতিহাসিক পারম্পর্য বা ক্রমের দিকে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাঁহার নিকট প্রত্যেকটি লীলাই নিত্য। আর কালের যে বোধ ঐতিহাসিকের ঘটনা - বর্ণনার ভিত্তি, তাহা ভক্ত কবির নিকট অসমগ্র দৃষ্টির পরিচায়ক। কবি বলেন

বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল।
চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল।।
যেন মহারাস-ক্রীড়া কত যুগ গৈল।
তিলার্ধেক হেন সর গোপিকা জানিল।। ২।৮।২১৬

চৈতন্যআখ্যানের ভিতরে সময় নিয়ে একটা সংঘাত আছে। রচনাকার নিজেকে ও তাঁর রচনাকে, তাঁর পূর্ববর্তী মহাজন ও কবিদের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দুতে স্থাপন করেছেন। তাঁর এই অবস্থান বরং অতিনির্দিষ্ট। আর একই সঙ্গে তিনি তাঁর রচনার বিষয়কে ও চৈতন্যের জীবনকে নির্দিষ্ট সময়ানুক্রম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সময় সম্পর্কে এই দুই বিপরীত বোধ চৈতন্যআখ্যানগুলির মধ্যে এক অন্যধরণের সৃষ্টিশীলতা সঞ্চার করেছে।

চার

চৈতন্য আখ্যানের ভিতরে এই সংঘাত স্থান নিয়েও আছে। চৈতন্য যে-যে জায়গায় গিয়েছেন, তাঁর ভ্রমণ ও পর্যটন, বিভিন্ন জায়গায় তাঁর বিভিন্ন ধরণের অভিযান - এইগুলি চৈতন্য আখ্যানের অন্তর্গত বিষয়, সমস্ত আখ্যানকারই এই সর স্থানের বর্ণনা দিয়েছেন আর তার ফলে চৈতন্যের এই পর্যটন তথ্যগত দিক থেকে এমন যাথার্থ পায় যে মানচিত্র এঁকে তাঁর এই ভ্রমণকে চিহ্নিত করা যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ। সর আখ্যানকারই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সম্পর্কে খানিকটা বাস্তববর্জিত কাল্পনিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। এ-বিষয়ে বিমানবিহারী মজুমদার বিশদ আলোচনা করেছেন। স্থান সম্পর্কিত সংঘাত তৈরি হয়েছে চৈতন্যের অবতারত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। বস্তুত সেই ব্যাখ্যায় স্থান ও সময় এই দুইয়েরই একটি সৃষ্টিশীল সংঘাত তৈরি করা হয়েছে।

চৈতন্য অবতার হিশেরে অবতীর্ণ হওয়ার আগে

প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব পরিকরে।
জন্ম লভিলেন সভে মানুষ ভিতরে।।
কার জন্ম নরদ্বীপে কার চাটিগ্রামে।
কেহ রাঢ় ওড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে।।

নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ।
নবদ্বীপ আসি হৈল সবার মিলন।।
(চৈতন্য ভাগবত, দ্বিতীয় অধ্যায়)

চৈতন্যের চাহতে তাব যে-অনুগামীরা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, চৈতন্যের জন্মে সঙ্গে তাঁদেব যুক্ত করতে এই ভাবে আখ্যান চৈতন্যের জন্মের আগে থেকে শুরু হয়েছে।

শ্রীবাস পন্ডিত আর শ্রীরাম পান্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত।।
ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণরের অবতার।।
পুন্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণবপ্রধান।
চৈতন্য বল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম।।
চাটিগ্রামে হৈল তা সবার পরকাশ।
বুঢ়নে হৈল অবতীর্ণ হরিদাস।।
বাঢ়মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যহি অবতীর্ণ হয় নিত্যানন্দ ভগবান।।
(চৈতন্যভাগবত, দ্বিতীয় অধ্যায়)

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের জন্মের আগেই তাঁর কাহিনী শুরু করেন ও সে - কাহিনীকে স্থানগত বিস্তাব দেন। তার সঙ্গে তাত্ত্বিক বিববণ যোগ করেন।

অদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই চৈতন্যের অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণে কহিয়ে উপাঙ্গ।।....
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য প্রভু সাক্ষাৎ ঈশ্বর।।
শ্রীবাসাদি পারিষদগণ সঙ্গে লৈঞা।
দুই সেনাপতি বলে কীতন কবিঞা।।
পাষন্ড দলন রালা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য হুঙ্কারে পাপ পাষন্ডী পালায়।।
(চৈতন্যচরিতামৃত, আনন্দ, আদিখন্ড পৃ.১৬)

আবার বৃন্দারন দাসের মত বিস্তারিত ভাবে না হলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁর রচনার শুরুতেই বলে নেন, নিজ অবতারত্বের প্রয়োজনে চৈতন্য তাঁর নিজের জন্মের আগেই জনক-জননী ও পৃথিবীতে তাঁর গুরুস্থানীয়দেব জন্ম নিতে পাঠান।

কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমেই করেন গুরু বর্গের সঞ্চার।।

পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সভার পৃথিবীতে জনন।।
মাধব ঈশ্বর পুরী শচী জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য প্রকট হইল সেই সাথ।।

(চৈতন্যচরিতামৃত, আনন্দ, আদিখন্ড, পৃ.১৬)

'চৈতন্য ভাগবত'-এ শেষখন্ড তথ্যগত ভাবে অসম্পূর্ণ। কিন্তু বৃন্দাবনদাসের কাছে চৈতন্য-আখ্যানের অর্থ তথ্যআহরণ নয়। তিনি যদি চৈতন্যের প্রয়ান, বা অবতারত্বের অবসান, বা এই জীবদেহ ত্যাগ, বা এই নরলীলা সংররণ বর্ণনা না করেন তা হলে চৈতন্যের যে-অবতার জীবন রণনা করার জন্যে তিনি কাব্য বচনা শুরু করেছিলেন, তাহহ অসম্পূর্ণ থাকবে। চৈতন্য আখ্যানকারদের কাছে চৈতন্য তাঁর লীলা অনুয়ায়ী খন্ডিত নন, প্রত্যেক লীলাতেই তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণ অবতার। তাহ 'চৈতন্য ভাগবত'-এর শেষখন্ড তথ্য হিশেবে অসম্পূর্ণ, অথচ কবি চৈতন্যবিষয়কে যে-ভারে কল্পনা করেছেন কাব্যরূপ হিশেবে সম্পূর্ণ।

ঠিক এর বিপরীত পদ্ধতি দেখা যায় 'চৈতন্যচরিতামৃত'তে। মঙ্গলাচরণের পর তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে কবি যেখানে তাঁর রচনার পরিকল্পনার কথা লিখছেন সেখানে, সেই আদিখন্ডেই, চৈতন্যের পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, তাঁর শেষ জীবনের বিশেষ অবস্থা ও তাৎপর্য শুধুমাত্র তথ্য হিশেবে উল্লেখিত হয়েছে, তাই নয়, বেশির ভাগ জায়গাতেই এই তথ্যকে তত্ত্বের আশ্রয় দেয়া হয়েছে। আমরা আদিখন্ডে যে-যে বিষয় উত্থাপিত হয়েছে তার একটি তালিকা থেকেই দেখতে পাই যে এই আদিখন্ডেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের সমগ্রতাকে তাঁর কাব্যের অন্তগত করে নিয়েছেন। চৈতন্যের জীরনের আদিখন্ড, মধ্যখন্ড বা শেষখন্ড এই বিভাজন চৈতন্যের পক্ষে সত্য নয় কারণ তিান তাঁর জন্মের আগে থেকেই অবতার। এই ভাগ তাঁর অনুগামীদের পক্ষে সত্য, কারণ এ-বকম ভাগ করে না নিলে তাঁবা এই জীবনের সামগ্রিক বৈচিত্র্যকে বুঝে উঠতে পাররেন না। এই ভাগ তাঁর আখ্যানকারদের পক্ষেও সত্য কারণ, এ-রকম ভাগ কবে না নিলে আখ্যানে তাঁব জীবনের সমগ্রতা প্রকাশ করা যাবে না। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর সমগ্র কার্যে যে বিষয় ক্রম-উদ্ঘাটিত হওয়ার কথা, আদিখন্ডেই তার সবিস্তার প্রস্তাবনা করেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

আদিখন্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে চৈতন্যের অরতাররূপ গ্রহণের প্রাথমিক কারণ, চৈতন্যের সর সময়ের সঙ্গীদের বিবরণ, কলিকালে নামসঙ্কীর্তনের বৈশিষ্ট্য, চৈতন্যের বিশ্বম্ভর নামের সার্থকতা, চৈতন্যের গায়ের রঙ সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা, চৈতন্যের আকৃতিতে মহাপুরুষের লক্ষণ, মহাভারত থেকে চেতন্য অবতারের প্রমাণ, চৈতন্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা, নাম-সঙ্কীর্তন প্রবর্তন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে যুগাবতার ও পূর্ণাবতাবের ভিতর পার্থক্য, চৈতন্যের আচন্ডালে কীর্তন প্রচারের উদ্দেশ্য, চেতন্য অরতারের প্রকৃত কাবণ। পঞ্চম পরিচ্ছেদে আছে নিত্যানন্দ তত্ত্ব, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈততত্ত্ব। সপ্তম পরিচ্ছেদে আছে চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের কাবণ, চৈতন্যের কাশীযাত্রা ও সেখানে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বিচার, সন্ন্যাসীদের কাছে নামমাহাত্ম্য রর্ণনা, শঙ্করের বিবর্তবাদ খন্ডন, ফলে কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের পারিরর্তন, চৈতন্যের নীলাচলে ফিরে আসা, চৈতন্য কীভাবে অপরাধীকে উদ্ধার করলেন তার বর্ণনা।

চৈতন্যের জীবনকে খন্ড অনুযায়ী ভাগ করায় মুবারিগুপ্তের কড়চার আদর্শই প্রধানত অনুসরণ কবা হয়েছে। গয়া যাওয়া ও গয়া থেকে ফিরে আসা (১৫০৮ ?) মুরারির প্রথম প্রক্রম, বৃন্দারনদাসের

আদিখন্ড। গয়া থেকে ফিরে আসা ও নবদ্বীপে চৈতন্যের ভাববিহ্বল জীবন কেটেছে সন্ন্যাস পর্যন্ত (২৫-২৬ জানুয়ারি, ১৫১০, চৈতন্যের বয়স ২৪)। এই নিয়ে মুরারির দ্বিতীয় প্রক্রম ও বৃন্দাবনদাসের মধ্যখন্ড। চেতন্যভাগতের অন্ত্যখন্ড কিছুটা দ্রুত লেখা ও ঘটনার সংক্ষপ্ত রর্ণনায় সম্পূর্ণ। তাতে অনেক ফাঁক আছে। মুরারির তৃতীয় প্রক্রম নিয়েই বৃন্দাবনদাসের অন্ত্যখন্ড। অর্থাৎ বিভিন্ন আখ্যানেব নিজস্ব বৈচিত্র্যের কথা বাদ দিলে এইটিই চৈতন্যজীবনের তিনটি প্রধান ভাগ - গয়া গমন পর্যন্ত, সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত ও জীবনাবসান পর্যন্ত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ভাগটি সামান্য বদলে নিয়েছেন। তাঁর আদিখন্ড চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ পযন্ত (১৫১০), মধ্যখন্ড তার পরের ছয় বৎসব চৈতন্যের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ নিয়ে - ১৫১০ থেকে ১৫১৬ পর্যন্ত। ১৫১৬তে পুরীতে প্রত্যাবর্তনের পর সেখানেই চৈতন্য স্থায়ী ভারে থাকেন, বথযাত্রাব সময় গৌড়দেশ থেকে তাঁর ভক্তরা তাঁকে দেখতে যেতেন ও সেখানে মাস চারেক থাকতেন। এই ১৫১৬ থেকে ১৫৩৩ পর্যন্ত ১৮ বছর কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিত অন্ত্যখন্ড।

চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যে যে কৈল তার আদিলীলা নাম।।
চব্বিশ রৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।।
সন্ন্যাস করি চব্বিশ রৎসর অবস্থান।
তাহা যে যে লীলা তার শেষ লীলা নাম।।
শেষ লীলার মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বেষ্ণব সব নাম ভেদ কয়।।
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন।।
তাঁহা য়েই লীলা তার মধ্যলীলা নাম।
তাব পাছে লীলা অন্ত্য লীলা আভিধান।।
(আনন্দ সংস্করণ, ১৯ থেকে ৩০ চবণ)

সন্ন্যাসগ্রহণের সিদ্ধান্তে আদিখন্ড শেষ হয়েছে। আবার সে-প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে মধ্যখন্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে। মধ্যখন্ডের প্রথম দুই পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যেব জীবনের মধ্যপর্ব ও অন্ত্যপর্বের বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে ঘটনার ধারাবাহিকতা পরিকল্পিতভাবে ছিন্ন করা হয়েছে ও মধ্যখন্ডের সূচনাতেই মধ্যখন্ডের সমগ্রতা ও অন্ত্যখন্ডের সমগ্রতা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে পাঠানো ও রূপ-সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠানো এই মধ্যখন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হয়েছে। এমনকী য়ে-জীব গোস্বামীর সঙ্গে চৈতন্যের দেখা হয় নি সেই জীবগোস্বামীর প্রসঙ্গও এই প্রথম পরিচ্ছেদেই এসেছে।

এই অংশ শুধু সূচিপত্রমাত্র নয়। এখানেও কবি অনুপুঙ্খের দিকে সমান নজর দিয়েছেন। 'য়ঃ কৌমারহবঃ' শ্লোক নিয়ে রূপগোস্বামীর সঙ্গে চৈতন্যের ভাববিনিময়ও এই অংশেই ঘটেছে। এমনকী রথযাত্রাব সময় গৌড়বাসী ভক্ত শিবানন্দ সেনের সঙ্গে একটি কুকুর হাঁটতে-হাঁটতে পুরী

পর্যন্ত আসে। সেই কুকুরটি পর্যন্ত এই অংশে উল্লিখিত হয়েছে। আবার তারপরে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে রূপসনাতনের সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্যের পযটন বর্ণনার শেষে কবি বলেছেন

ছয় বর্ষ প্রভু এছে করিলা বিলাস।
কভু ইতি উতি ফিরে কভু ক্ষেত্রবাস।। ....
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠার বর্ষ তাহা বাস কাঁহা নাহি গেলা।।
প্রতি বর্ষ আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সঙ্কীর্তন।।

মধ্যখন্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫২২ থেকে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চৈতন্যের কৃষ্ণবিরহ ও প্রলাপমুখর জীবনের বর্ণনা করেছেন ত্রিপদীতে। এ-অংশে ঘটনা প্রায় নেই বললেই চলে কিন্তু চৈতন্যের জীবনের শেষ পর্বের দিব্যোন্মাদ অবস্থার বর্ণনা কবি দিয়েছেন আপাতবিচ্ছিন্ন কিছু পদাবলিতে। পর্যটন শেষে ১৫১৬তে পুরীতে প্রত্যাগমনের পরও বছর ছয়েক চৈতন্য ভক্তদের সঙ্গে মিলিত ধর্মজীবন যাপন করেছেন। কিন্তু ১৫২২ থেকে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য এক নিভৃত থেকে নিভৃততর জীবন যাপন করছেন। তাঁর ভক্ত ও অনুগামীরা সেই জীবনের দর্শকমাত্র আর তাঁদের চোখের সামনে সত্য হয়ে উঠছিল দিব্যোন্মাদনাগ্রস্ত এক সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন যার কাছে ঈশ্বরের জন্যে কামনা সমস্ত বস্তু কামনার চাইতেও বড়।

নিরন্তর কয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ।।
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে।।
গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব।
ভিতে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সর।।
(আনন্দ, ১২৬ পৃ. ৭-১২ চরণ)

এই প্রেম আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন।।
(আনন্দ, ১২৯ পৃ. ১৮ স্তবক)

এই ভাবে 'চৈতন্যচরিতামৃত'তে সময়ের ধারাবাহিকতা কবি স্বেচ্ছায় নষ্ট করে দেন, সন্ন্যাসগ্রহণের সিদ্ধান্তেব পরই চলে আসে চৈতন্যের শেষ জীবনের আখ্যান, শেষ জীবনের আখ্যানের মাঝখানেই আসে ঘনিষ্ঠ ভক্তজনের নানা ঘটনা, নানা কাহিনী। সেই সব কাহিনীও যে ঐতিহাসিক ক্রম মেনে চলে তা নয়, বরং ঐতিহাসিক ক্রম ভেঙে দেয়া হয়।

ঐতিহাসিক ক্রম ভাঙাব পরে কাহিনী আবার ফিরে আসে তার কালানুক্রমে। মধ্যখন্ডের তৃতীয় পবিচ্ছেদ থেকে আদিখন্ডের শেষে ছিন্ন কাহিনীর সূত্র কবি তুলে নেন। এই প্রক্রিয়া সম্ভব হয়ে ওঠে কারণ প্রথম থেকেই চৈতন্য তাঁর সামগ্রিকতা নিয়ে কাব্যে উপস্থিত। চৈতন্যজীবনের সেই সামগ্রকতা অখন্ড। চৈতন্য-আখ্যানে চৈতন্যের জীবনের এই অখন্ড কল্পনাই কাব্যে-কাব্যে বিস্তারিত হয়েছে। সেই অখন্ড কল্পনাকে কোথাও কোনো কবি ছিন্ন করেন নি।

আখ্যানের এই অখন্ডতার ফলে বিভিন্ন রচয়িতার বিবিধ রচনার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আর প্রধান থাকে না, প্রধান হয়ে ওঠে সেই সব বিবিধ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট রচনার মধ্য দিয়ে নির্মিত চৈতন্য আখ্যানের সমগ্রতা ও অখন্ডতা। মুরারিগুপ্ত কবি কর্ণপুর থেকে পৃথক থাকেন না, বা স্বরূপ দামোদর তাঁর রচনাব বিশিষ্টতায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যান না। বৃন্দাবনদাস থেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ পর্যন্ত একটিমাত্র আখ্যান হয়ে ওঠে। তার কোথাও পুনরাবৃত্তি ঘটে, কোথাও কোনো একটি কাহিনীর নানা বকমেব পাঠ দেখা যায়, কোথাও হয়ত একটি ঘটনার উল্লেখ থাকে আর আর-একটি ঘটনা অনুল্লিখিত থাকে, কোথাও চৈতন্যের পার্শ্বদদের ভূমিকা বিভিন্ন অনুপুঙ্খে প্রাধান্য পায়, কোথাও বিরোধী পক্ষের সঙ্গে চৈতন্যের বিরোধিতা নাটকীয় হয়ে ওঠে. কোথাও নিজের অবতারত্ব নিয়ে চৈতন্যের কোনো রসিকতা আখ্যানের ভিতব নতুন তাৎপর্য তৈরি কবে, কোথাও কোনো পক্ষের উল্লেখ ছাড়াই ত্রিপদীতে-ত্রিপদীতে চৈতন্যের অনুভব বা তাঁর পার্শ্বদদের অনুভব ছড়িয়ে পড়ে।

চৈতন্য আখ্যানের অন্তর্গত সমস্ত কাব্য, গীতি ও কাহিনী একটি অখন্ড. নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সৃষ্টি করে তুলেছে। আমরা যখন সেই আখ্যানের ভিতর উপন্যাসের কী কী উপকরণের বীজ নিহিত আছে এই সন্ধান করব তখন চৈতন্যআখ্যানের স্বাতন্ত্র্য নিরপেক্ষ এই অখন্ড ও সামগ্রিক প্রকৃতিকেই আমাদের বিরেচ্য পাঠ্যবিষয় বলে গ্রহণ করর। আমাদের সে-বিবেচনায় বৃন্দাবনদাস থেকে লোচনদাস বিচ্ছিন্ন নয় বা কৃষ্ণদাস কবিবাজ স্বতন্ত্র নয়। বরং এইসর কাব্য মিলেই সেই অখন্ড চৈতন্যআখ্যান নির্মিত হয়েছে। কোনো একটি কাব্যকে সেখান থেকে বাদ দিলে যেমন সেই চৈতন্য-আখ্যানের অখন্ডতা ব্যাহত হয়, তেমনি জানা না-জানা সমস্ত কাব্যের সমারেশেই সেই চৈতন্য-আখ্যানের অখন্ডতা ও সমগ্রতা নির্দিষ্ট আকার পায়।

This work is licensed under a
Creative Commons
Attribution – NonCommercial - NoDerivs 3.0 License.

To view a copy of the license please see:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/